সংযম-সাধনা

অভিজ্ঞা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

সপ্তম সংস্করণের নিবেদন

দেশব্যাপী অকাল-বীর্য্যক্ষয়ের প্রচ্ছন্ন পাপস্রোতের প্রতিরোধ-কল্পে পরমপূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী দীর্ঘকাল যাবৎ নিজ সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্রামের চিন্তায় বিরত হইয়া, একমাত্র বালক ও কিশোরদের অনৈতিকতার প্রশমনকল্পে সুকঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্র স্বীকার করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার মহতী প্রচেষ্টা ভূয়সী সফলতাও লাভ করিয়াছে। কুসঙ্গের মোহে যাহারা জীবনের কল্যাণকে ভুলিয়াছিল, এমন কত বালক ও যুবকের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে, হতাশার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া যাহারা জীবনকে মরণসম যন্ত্রণাপ্রদ দেখিতেছিল, এমন কত হতভাগ্য আত্মবিশ্বাস ও আত্মস্থতা ফিরিয়া পাইতেছে, কত মরীচিকাভ্রান্ত দগ্ধমরুচারীর পরম-শান্তিপ্রদ অমৃতময় পন্থার দিগ্‌দর্শন মিলিয়াছে।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অভিক্ষু সন্ন্যাসী। দেশকর্ম্মীর প্রশস্ত ললাটে পরমুখাপেক্ষিতার যে দুঃখদ কলঙ্করেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রণবাহিণী পরিচালনা করিয়াছেন। কাহারও দুয়ারে চাঁদার খাতা লইয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়ান নাই, কাহারও নিকটে কখনও একটী কপর্দ্দক মাত্র ভিক্ষা চাহেন নাই, অথচ পুপুন্‌কী আশ্রমের একশত বিঘা অরণ্য-ভূমি কদন্নক্লিষ্ট ও অর্দ্ধাহার-শীর্ণ ত্যাগিগণেরই বজ্রবাহুর পীড়নে দিনের পর দিন নূতন নূতন শাকসব্জী ও ফসলে পূর্ণ হইয়াছে, বৎসরে প্রায় দুই হাজার রোগীকে * বিনামূল্যে চিকিৎসা

* ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৫৩ পর্য্যন্ত বৎসরে দুই হাজার রোগীর চিকিৎসা হইত। ১৩৫৩ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মাসে দেড় হাজার রোগীর চিকিৎসা বিনামূল্যে হইতেছে। ১৭—১—৬১

করা হইতেছে, আশ্রম-মধ্যে নানাপ্রকার ফলকর বৃক্ষের চারা ও শাক-সব্জীর বীজ উৎপাদন করিয়া অকাতরে তাহা বিভিন্ন জেলার গ্রামে গ্রামে বিতরিত ও গৃহে গৃহে রোপিত হইয়াছে, পল্লীতে পল্লীতে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, পল্লীসংগঠন ও জীবসেবার পুণ্যকথা প্রচারিত হইয়াছে। আশ্রমের ধর্ম্ম সনাতন বাহুবল, এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীশ্রী-বাবামণি স্বয়ং এবং তাঁহার ব্রহ্মচারী কর্ম্মীরা বীর-বিক্রমে গাতি কোদাল চালাইয়াছেন এবং কোনও দিন কাঁচা ঝিঙ্গা চিবাইয়া, কোনও দিন ঢেঁড়শ পাতা সিদ্ধ করিয়া, কোনও দিন অখাদ্য তিক্ত-কটু-স্বাদ পলাশ ফুলের চর্চ্চরী রাঁধিয়া দৈনিক মোট সাড়ে ছয় পয়সার খোরাকীর বরাদ্দে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতঃ "অভিষ্কার" বৈজয়ন্তীকে বিজয়শ্রী-মণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত বড় কর্ম্মটী সম্পাদনের জন্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি কর্ম্মি-সংগ্রহার্থে প্রচলিত কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই। একটী যুবককেও তিনি তাঁহার সঙ্গী হইয়া অনশন, অর্দ্ধাশন, অতিশ্রম প্রভৃতিকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে আহ্বান করেন নাই। পাথরের মত শক্ত মৃত্তিকার দৃঢ়তার দম্ভ চূর্ণ করিবার জন্য বঙ্গজননীর যে তেজস্বী সন্তানেরা শ্রীশ্রী-স্বরূপানন্দের পদধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহার পার্শ্বচর হইয়া দাঁড়াইলেন, ছোটনাগপুরের অসহনীয় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে কৃষ্ণ-কলেবর হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সাথে সাথে গাতি-কোদাল চালাইলেন, বারি-ধারা নিবারণে অক্ষম জীর্ণ পর্ণকুটীরে দিনের পর দিন ভিজিয়া কাটাইলেন, অব্যর্থ-বিষ গোখরা সাপের লীলাস্থলীতে সর্প-কুলের সঙ্গে এক গৃহে কখনও বা দৈবক্রমে এক মশারীর নীচে ভয়াবহ রজনী যাপন করিলেন,

জলহীন সেই মরুভূমিতে তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠতালু অবস্থায় এক দিন নহে, দুইদিন নহে, অসংখ্য দিন মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ আস্বাদন লাভ করিলেন, যাইতে আসিতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী জলহীন শুষ্ক ঝরণার প্রস্তরময় বুকের পাঁজর ভাঙ্গিতে নিজের হাতের আঙ্গুল চিরিয়া তপ্ত রক্তের বিনিময়ে সুদুর্লভ পানীয় সংগ্রহ করিলেন, কোনও দিন বা ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যভ্রমে বিষাক্ত বনলতা সিদ্ধ করিয়া খাইতে যাইয়া দৈবানুগ্রহেই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইলেন, তাঁহারা একজনেও শ্রীশ্রীবাবামণির নিমন্ত্রিত অতিথি নহেন ; স্বেচ্ছায় ইঁহারা আসিয়াছেন, স্বেচ্ছায় ইঁহারা কঠোর কৃচ্ছ্রকে বরণ করিয়াছেন এবং "অভিক্ষার" ত্রিলোক-বিজয়িনী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীশ্রী-স্বরূপানন্দের ঋষিত্বে বিশ্বাসী হইয়াছেন। অভিক্ষার ঋষি জাতিকে স্বাবলম্বী করিবার জন্যই আজ ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার করিতেছেন। কারণ, স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়াই ভারত তাহার লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিবে।

* * * *

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী মহারাজ প্রণীত "সংযম-সাধনা" গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ পাঠকবর্গের হস্তে অর্পণ করিবার কালে আমরা আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থের পূর্ব্ব সংস্করণ-সমূহ অতি অল্প সময়-মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া দ্বারাই ইহার প্রতি জনসাধারণের স্নেহের আতিশয্য প্রমাণিত হয় নাই, পরন্তু বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতি সাদর নিমন্ত্রণ ও সশ্রদ্ধ সম্বর্দ্ধনা দ্বারাও এই গ্রন্থের সময়োপযোগিতা সম্বন্ধে নির্ভুল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, খুলনা, যশোহর,

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪-পরগণা, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও বালেশ্বর জেলার বহু বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সংযম-বিষয়ে উপদেশ দান করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিয়াছেন এবং পরহিতব্রত স্বামীজী প্রত্যেক-স্থানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ওজস্বিনী ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণ-সমূহ প্রদান করিয়া তরুণ যুবকদের আত্মগঠনে সহায়তা দান করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই স্কুল ও কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণের মধুময় ব্যবহারে আমাদের উপলব্ধি জন্মিয়াছে যে, এখনো শিক্ষাব্রতধারী আচার্য্যদের মধ্যে এমন বহু সজ্জন বিরাজমান রহিয়াছেন, সত্য সত্যই যাঁহারা শিক্ষার সহিত চারিত্রিক মাধুর্য্যের সমন্বয়-সাধনাকে বিদ্যার্থিবর্গের ইহপরকালের অভ্যুদয়ের পক্ষে একান্তই আবশ্যকীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা এই সুযোগে উল্লিখিত বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে দীক্ষালাভের প্রার্থনা জানাইয়া বাংলার প্রত্যেক জেলা হইতে শত শত পত্র আসিতেছে। দীক্ষাগ্রহণ ও তৎসহায়ে জীবন-গঠনের চেষ্টা সাধক-জীবনের একটা খুব বড় কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু শত শত পত্রের উত্তর দেওয়া শ্রীশ্রী-বাবামণির পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া এই সম্পর্কে তাঁহার অভিমত এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বকীয় সাধন-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা শ্রীশ্রীবাবামণি প্রয়োজন মনে করেন না। গ্রন্থ-লিখিত উপদেশ-সমূহ একনিষ্ঠ প্রযত্নে ও সুগভীর অধ্যবসায় সহকারে পালন করিয়া যাঁহারা জীবন-গঠনে ঐকান্তিকতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং মহনীয় আদর্শের চরণে নিজেকে

সম্যক্ সমর্পণ করিয়া দিবার মত মনোবল যাঁহাদের উপচিত হইয়াছে, এমন ব্যক্তিরাই জগতে সাধন-দীক্ষা লাভ করিলে তাহার মর্য্যাদা অটুট রাখিতে পারেন এবং এমন ব্যক্তির পক্ষেই সদ্গুরু একান্ত সুলভ। কার জন্য সদ্গুরু কোন্ রূপ ধরিয়া কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা আত্ম-গঠনের অমিত-বিক্রম প্রয়াসের সহিতই পরিস্ফুট হইবে,—তাহার পূর্ব্বে "হা গুরু কৈ গুরু" বলিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ভাসিয়া চলিলেই সদ্গুরু মিলিবে না। শ্রীশ্রীবাবামণির অমূল্য উপদেশ-সমূহ পাইয়া উপকৃত হইবার আগ্রহ যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা "অখণ্ড-সংহিতা বা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী" নামক বহু খণ্ডে প্রকাশিত মহাগ্রন্থ পাঠ করিবেন।

যদ্যপি "সংযম-সাধনা" গ্রন্থ একমাত্র যুবকদের জন্যই রচিত হইয়াছিল, তথাপি এই গ্রন্থপাঠে বহু কিশোরী এবং যুবতীও উপকৃতা হইয়াছেন বলিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের উপযোগী এই জাতীয় হিতকর-গ্রন্থ প্রণয়নের অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারতের কিশোরী এবং যুবতীরাও যে পাশ্চাত্যের ভোগ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দ ও আশার কথা। শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত "কুমারীর পবিত্রতা" গ্রন্থ সকলেই নিজ নিজ ভগিনীকে প্রদান করুন।

আমাদের অনেক পদস্খলিত অপরিচিত ভ্রাতা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে নিয়ত হতাশাপূর্ণ পত্র লিখিয়া থাকেন। "সংযম-সাধনা" গ্রন্থ তাঁহাদের জীবন-পথ-প্রাপ্তির এক বিরাট আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। সহস্র সহস্র পথভ্রান্ত যুবক এই গ্রন্থকে ইন্দ্রিয়দমনের পাশুপত অস্ত্ররূপে গ্রহণ

করিয়া বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালার তথা ভারতের যুবক আজ আত্মবিস্মৃতির পঙ্ক-প্রবাহ হইতে গাত্রোত্তোলন করুন, শক্তিমান্ সদ্‌গুরুর বীর্য্যময়ী বাণী শ্রবণে আত্মোদ্ধার করুন, জগদুদ্ধার করুন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষ উঠিবে আবার জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুন ব্রহ্মচর্য্যে লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্রবীর্য্য শৌর্য্য, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে, জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ, শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।"

এই ব্রহ্মচর্য্য শুধু পুরুষ-জাতিরই ব্রহ্মচর্য্য নহে, নারীজাতির ভিতরেও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। ক্ষণিক সুখের লোভে উদ্‌ভ্রান্তা হইয়া নিত্যসুখকে জলাঞ্জলি দেওয়া যে অনুপম মূর্খতা, জীবনকে পরমসুখান্বিত করিতে হইলে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভোগবুদ্ধিকে সংযত করিয়া ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি ও বৃত্তির সদ্ব্যবহারে প্রয়াসিনী হওয়াই যে প্রকৃষ্টতম পন্থা, এই প্রত্যয় নারীজাতির ভিতরেও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। বিলাস-বিভ্রমে চপলচিত্তা হইয়া নিয়ত ক্ষণিক সুখের অন্বেষণেই নারী-জীবন যে তাহার প্রকৃত চরিতার্থতাকে প্রাপ্ত হয় না, সংসারের সহস্র সুখলোভের অতীতে যে নির্ব্বিকার মোহহীন এক আনন্দময় জগতে রমণী তাহার জীবনের পরম রমণীয়ত্ব আহরণ করিবেন, এই বাণী কুটীরে কুটীরে প্রতি কন্যার কর্ণে প্রাবেশিত করাইবার প্রয়োজন আছে। এই জন্যই শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীহস্ত-নিঃসৃত এই অমূল্য উপদেশপূর্ণ "সংযম-সাধনা" গ্রন্থের পাঠক যুবক-ভ্রাতৃবর্গের

প্রতি নিবেদন এই যে, জীবন-গঠনের পথে আপনারা একাকীই অগ্রসর হইয়া মনে করিবেন না যে, যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া ফেলিয়াছেন, আপনাদের কনিষ্ঠা ভগিনীদের অন্তরেও আত্মগঠনের এবং জীব-কল্যাণ-সাধনের প্রেরণা প্রদান করিবেন। এই জন্যই আত্মগঠন-পরায়ণ ও চরিত্র-সম্পদ আহরণে ব্রতী পরম-স্নেহের যুবক ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের প্রার্থনা এই যে, নিজ নিজ ভগিনীগুলি যাহাতে বিলাসের পুতুল সাজিয়া অভিভাবক-চক্ষের অন্তরালে নানা কদর্য্য অপশিক্ষা আহরণ করিয়া জীবনকে ভারগ্রস্ত ও তাপদগ্ধ করিতে না প্রলুব্ধা হয়, তাহার জন্য সময় থাকিতে তাহাদিগকে উপযুক্ত সতর্কতার বাণী শ্রবণ করাইবেন এবং সংশিক্ষা প্রদান করিতে চেষ্টা করিবেন। ইতি—
বৈশাখ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১

বিনীত নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন

(সংক্ষেপিত)

* * * *

আজকাল অনেক স্থানেই মুদ্রিত পুস্তকের ভূমিকায় বা মাসিক পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনার প্রসঙ্গে একটা কথা খুব আলোচিত হইতে

দেখা যায় যে, অমুক লেখক তমুক লেখকের বহি হইতে আসন-মুদ্রার কথা চুরি করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অমুক সাধু তমুক সাধুর আগে যৌগিক আসন-মুদ্রার প্রচলনে চেষ্টা করিয়া পথিকৃৎ হইয়াছেন ও জনসমাজের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন,—ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই এমন কথাটী দাবী করেন নাই যে, অমুক লেখক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত মিল রাখিয়া সর্ব্বপ্রথম যৌগিক আসন-মুদ্রার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল বিকৃত আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়াই আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই কার্য্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সকলের আগে করেন এবং তাহা করেন দুইটী রীতিতে। প্রথমতঃ দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষুদ্র ও বিরাট জন-সভাসমূহ আহ্বান করিয়া তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ-দান-প্রসঙ্গে যৌগিক আসনমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্বের ও শারীরযন্ত্র সমূহের কার্য্যাবলির বিজ্ঞান-পরিজ্ঞাত ব্যাখ্যা-সমূহের সাহায্যে যৌগিক আসন-মুদ্রার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা-বোধ লোক-মনে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন। এই কার্য্য তিনি বাংলা ১৩২৮ সালের আগে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ইহা করেন, "সংযম-সাধনা" পুস্তকখানার প্রচার করিয়া। ইহার প্রথম সংস্করণ বাংলা ১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়। মুদ্রণ করেন ময়মনসিংহের চারু প্রেস। দুইটী কার্য্যেই তিনি অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নানাস্থানে সভা করিবার জন্য নিজ পকেটের টাকা খরচ করিয়া রেলভাড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, নিজের ব্যয়ে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছেন। নিজের ব্যয়ে পেট্রোম্যাক্স্ বাতি কিনিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়াছেন, অসংখ্য স্থানে এমন কি সভা

করিবার জন্য টুল-টেবিল যোগাড় করিয়াছেন, শতরঞ্চ বিছাইয়াছেন, হলের ভাড়া দিয়াছেন নিজ তহবিল হইতে। আর এই পুস্তকখানার রচনার মধ্যে কোথায় তাঁহার স্বাতন্ত্র্য, তাহা বুঝিবার জন্য পুস্তকখানা পাঠ করাই যথেষ্ট। এই সম্পর্কে আমাদের পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা নিরর্থক। * * * একদা বাঙ্গালী যুবকের কাছে পথের সন্ধান দিবার জন্য বিশেষ দাবী আসিয়াছিল। গুরুগিরি করিবার জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ যুবককে স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ মনস্বীর মনীষার প্রয়োজন হইয়াছিল। খ্যাত-অখ্যাত অনেক বাঙ্গালী মনীষী সেই সময়ে জাতির নবজীবন জাগাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য স্বরূপানন্দ একজন অনন্যসাধারণ নীরব সাধক। তিনি গান গাহিয়াছেন, প্রাণ জাগাইয়াছেন কিন্তু নিজেকে ধরা দেন নাই। নিজেকে বিলোপ করিয়া দিয়া দেশসেবার মহাব্রত যাঁহারা লইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন অতিশয় অগ্রগণ্য সাধক এই "সংযম-সাধনার" লেখক। প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি অক্ষরে এই ব্যক্তিত্বের অনপনেয় ছাপ মুদ্রিত রহিয়াছে। আশা করি, অন্যান্য সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণও সমাদৃত হইবে। এই সংস্করণে তিন চারিটী স্থলে দুই চারিটী শব্দ বা দুই একটী বাক্য নূতন সংযোজন এবং সংশোধন হইয়াছে।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীকরলিখিত জাতিগঠনমূলক অপূর্ব্ব গ্রন্থ "সংযম-সাধনার" অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ-কালে আমরা আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে, ভারতমাতার পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার সাধনা হিসাবেই তিনি তাঁহার অমূল্য রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ ভারতে স্বাধীনতা আসিয়াছে, ভারত আর পরাধীন নহে। সেই পরিবর্ত্তিত জীবনেও

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের দান অতুলন। তিনি বীর্য্যবান্ জাতি গড়িতে চাহিয়াছিলেন, সকল অন্যায় ও অত্যাচারের সমূহ উৎখাতের জন্য। তিনি যাহা সেই দিন চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রয়োজন আজও ফুরায় নাই।

স্বাধীন ভারতের যুবক-যুবতীদের চরিত্র-বল ও অসমসাহসিকতার প্রয়োজন আগের চেয়েও শত গুণ অধিক। তাই শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ পরাধীন ভারতের যেমন ছিলেন সহস্র সহস্র যুবক-যুবতীর ধ্যানের দেবতা, আজও তেমন থাকিতেছেন।

অভিক্ষার তিনি প্রচারক ও প্রবর্ত্তক।

আজ যে বনমহোৎসব করিয়া করিয়া কত অর্থের অপচয় হইতেছে, তাহাকে কার্য্যে রূপ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তিনি। বাংলা ১৩৩৪ সাল হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ফলবৃক্ষের চারা উৎপাদন করিয়া তিনি গৃহে গৃহে বহন করিয়া নিয়া বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। একটী বৎসর তাহার সংখ্যা এক লক্ষকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

বাংলার প্রতিটী বিপ্লবী স্বাধীনতাকামী কর্ম্মিদলের কর্ম্মীরা তাঁহার দল-নিরপেক্ষ সেবা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহার মানস সন্তান। কিন্তু তাঁহার এই অতুলনীয় অবদানের প্রতিদান তিনি দেশবাসীর নিকটে কখনও প্রার্থনা করেন নাই।

পুস্তক রচনারই জন্য লেখনী-ধারণ শ্রীশ্রীবাবামণির জীবনে খুব কমই ঘটিয়াছে। পুস্তক-রচয়িতা লেখনী-ধারণ করেন সর্ব্বসাধারণের জন্য, তাঁহার সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট-ভাবে কোনও একটী লোক উপস্থিত

থাকেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির জীবনব্যাপী রচনার প্রায় সবই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে আদর্শদাতার নির্দ্দেশ, প্রেরণাদাতার পত্র। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানা পত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছিলেন,—"**বলহীন, বীর্য্যহীন, ক্লীবপ্রায়, আত্মচেতনাহীন জাতি কি কখনও নিজেকে দুঃখ, দৈন্য ও পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারে? শক্তিহীনের কি কখনও পর-মুখাপেক্ষিতা ঘোচে? দুর্ব্বলের ললাটে কি কখনও রক্ত-তরাগদীপ্ত রাজটীকা শোভা পায়, না, চিরদাসত্বের পূতিগন্ধময় পঙ্কলেখা সে ললাট হইতে কেহ কখনও মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়?**" ঠিক এই প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াই ব্রাহ্মণবাড়িয়া-বাস্তব্য তিনটী তরুণ কিশোরের নিকটে ধারাবাহিক ভাবে কয়েকখানা বিরাট পত্র লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজনের বাড়ী কুমিল্লার খড়িয়ালা, অপরের বাড়ী কুমিল্লার গুপ্‌টী, তৃতীয়ের বাড়ী শ্রীহট্টের দত্তপাড়া। এই পত্রগুলি তাঁহাদের এবং তৎসঙ্গীয়দের অন্তরে আত্মগঠনের অফুরন্ত প্রেরণা এবং অপরিসীম উদ্যম দিয়াছিল। উহাই সংশোধনান্তে এই পুস্তক রূপে প্রকাশিত হয়।

দেশের এক একটা পরম সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব উল্কার বেগে প্রদেশের পর প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন এবং বজ্রকণ্ঠে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জাতিকে উদ্ধারের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই উপদেশে কোন অন্যায়ের সহিত আপোষের দুর্ব্বলতা ছিল না, কোনও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চাপাইয়া দিবার বাহাদুরী ছিল না, মানুষের বিভ্রান্ত মনকে বিপথে পরিচালন করিয়া দিয়া নিজের নেতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের কুমতলব ছিল

না,—অকপট শুভেচ্ছায় তিনি জাতিকে বিনা প্রতিদানে সেবা দিয়াছেন। ভারতীয় মহাজাতি তাহার ভাবী পরিবিকাশের জন্য এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের অঙ্গুলী-সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইতি—১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

দ্বাদশ সংস্করণের নিবেদন

একখানা গ্রন্থের দ্বাদশ সংস্করণ হওয়া বঙ্গভাষার খুব সাধারণ ঘটনা নহে,—বিশেষতঃ সেই গ্রন্থ যদি হয় চরিত্র, সন্নীতি ও সদাচারের প্রচারক। "সংযম-সাধনা"র দ্বাদশ সংস্করণের প্রকাশ-কালে অযাচক আশ্রম তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর শ্রদ্ধাবান্ পাঠক-পাঠিকাদিগকে সানন্দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

"সংযম-সাধনা" একখানা যুগান্তকারী গ্রন্থ। অতি সঙ্গোপনে দেশের ভাবী ইতিহাস ইহা রচনা করিয়া চলিয়াছে। বাহিরে যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা দেখা গেলেও যে নীরব তপস্যা ভারতের ভাবী জীবন গড়িবার কাজ লোক-চক্ষুর অগোচরে

থাকিয়া নিরন্তর করিয়া যাইতেছে, "সংযম-সাধনা" তাঁহার একটি জীবন্ত সাক্ষী, একটী অলন্ত-প্রদীপ। এই প্রদীপের আলোকে প্রত্যেক ভারতীয় কিশোর ও যুবকের অন্তর উদ্ভাসিত হউক। তাহারা সঙ্কল্প করুক,—"ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি,—আমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি, আমার জীবন বিশ্বের কুশলের জন্য।"

বাংলা ১৩৬৮র পৌষ মাসে গ্রন্থের নবম সংস্করণ, ১৩৭৬ সালের আশ্বিন মাসে ইহার দশম সংস্করণ এবং বাংলা ১৩৮৪র আষাঢ় মাসে ইহার একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। দশম সংস্করণে পুস্তক ছয় হাজার এবং একাদশ সংস্করণে পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বাদশ সংস্করণে পাঁচ হাজার পুস্তক মুদ্রিত হইল। ইতি—ভাদ্র, ১৩৮

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

বিনীত নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ওঁ

সংযম-সাধনা

শুক্রক্ষয়ের দেহতত্ত্ব

বীর্য্যক্ষয় সকল দুঃখের ও দুর্গতির আকর। বীর্য্যক্ষয়ে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক সর্ব্বপ্রকার অধঃপতন হয়। দুধ-সর, ছানা-ননী খাও, ডন-কুস্তি, ডাম্বেল-মুদ্গর কর, আর সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্যক্ষয় কর,— কিছুতেই তোমার দেহ সুগঠিত হইবে না, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না।

বীর্য্যক্ষয়ই সকল দুর্গতির মূল কারণ

সাংখ্য-পাতঞ্জল পড়, ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগের অনুশীলন কর কিম্বা বিশ্বপ্রেমের মলয়-হিল্লোলে উড়িয়া বেড়াও, আর গোপনে গোপনে বীর্য্যক্ষয় কর,—কিছুতেই তোমার কিছু হইবে না, যোগীও হইতে পারিবে না, জ্ঞানীও হইতে পারিবে না, ভক্তিও লাভ করিতে পারিবে না, বিশ্বকেও ভালবাসিতে সমর্থ হইবে না। গীতাই কণ্ঠস্থ কর, আর অহোরাত্র হরিসঙ্কীর্ত্তনই কর, বীর্য্যক্ষয় যদি রুদ্ধ না কর, তোমার ধর্ম্মজীবনও প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না। পরন্তু দেহের সার পদার্থ শুক্রধাতুকে যদি ধরিয়া রাখিতে পার, ডাল-ভাত খাইয়াও তোমার দেহের কান্তি-পুষ্টি ফাটিয়া পড়িবে, শাস্ত্রচর্চ্চা না করিয়াও একমাত্র নিয়ত উপাসনার ফলেই তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব দূর হইবে। কারণ, যাহার ব্যয় নাই, আয় যদি তাহার সামান্যও হয়, তথাপি কালক্রমে সে কোটিপতি হইতে পারে। বীর্য্যকে যদি ক্ষয়িত না

বীর্য্যক্ষয়-নিবারণই অভ্যুদয়ের উৎস

কর, তাহা হইলে সাধারণ আহার্য্য বস্তু যেটুকু রস-রক্তাদি উৎপন্ন করিবে, তাহাই দিনের পর দিন তোমাকে অধিকতর বলবান্ এবং সামর্থ্যশালী করিয়া তুলিবে। বীর্য্যক্ষয়-পরায়ণের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল এবং সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুমণ্ডলী অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ফলে, অনুভবের শক্তি ও চিন্তার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং উপনিষৎ প্রভৃতি মহাজ্ঞানপূর্ণ শাস্ত্রনিবহের প্রাণারাম উপদেশ চিত্তে ধারণ করিয়া রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়; সমগ্র জীবন নাম-কীর্ত্তন করিয়াও মহোৎসবের পাচকের ন্যায় সর্ব্বশেষে অপক্ব চাউল-ডাইল কোমরে বাঁধিয়া লইয়া তাঁহাকে শুষ্কমুখে শূন্যোদরে ঘরে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এইজন্য তোমাদের প্রত্যেককে আজ বীর্য্যধারণক্ষম হইতে হইবে, স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সর্ব্বপ্রকার বীর্য্যক্ষয় রুদ্ধ করিতে হইবে। যদি পরবর্ত্তী জীবনে গৃহী হইয়া সাংসারিক সুখশান্তি লাভ করিবার লোভ তোমার থাকে, তাহা হইলে যেমন বীর্য্যরক্ষা প্রয়োজন, তোমার যদি সন্ন্যাসের গৈরিক-রঞ্জিত প্রসন্ন জীবনের উপরে লক্ষ্য পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তেমন বীর্য্যরক্ষা প্রয়োজন। কারণ, নির্ব্বীর্য্য সংসারী এবং নির্ব্বীর্য্য সন্ন্যাসী, উভয়েই সমান দুঃখী, উভয়েই সমান অনুকম্পার পাত্র। অপিচ, বীর্য্যবান্ সন্ন্যাসী এবং বীর্য্যবান্ গৃহী, উভয়েই সমান সুখী এবং জনসাধারণের সমান শ্রদ্ধার পাত্র। সংসারী এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বা কে নিকৃষ্ট, এই দ্বন্দ্ব সেখানে থাকে না, যেখানে উভয়েই নিজ আশ্রমের পরিপূর্ণ মর্য্যাদার রক্ষণকারী। কিন্তু স্বকীয় আশ্রমের মহিমা হইতে চ্যুত হইলে গৃহী কিম্বা ত্যাগী উভয়েই

অনাদৃত হইয়া থাকেন। এই কারণে, ভাবী সন্ন্যাস বা ভাবী গার্হস্থ্য, যাহার উপরেই তোমার জীবনের লক্ষ্য পড়িয়া থাকুক, প্রাণপণ যত্নে বীর্য্যধারণ তোমাকে করিতেই হইবে।

আজ দেশে দলে-দলে যোগ্য জনক চাই। যাঁহারা গৃহী হইবেন, তাঁহারা যাহাতে রুগ্ন, ক্লীব ও পঙ্গুর পিতা না হইয়া সমর্থ সন্তান-সন্ততির পিতা হইতে পারেন, মানুষের বংশে একদল শূকর-ছানার জন্ম না দিয়া যাহাতে দেশের গৌরববর্দ্ধনকারী, কুলের মুখোজ্জ্বলকারী, দৃঢ়দেহ, কঠোরকর্ম্মা, পূর্ণমেধা, অক্ষুণ্ণশক্তি, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দেবস্বভাব মানবের আগমনকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন, এইজন্য তাঁহাদের প্রথম জীবনের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতের ফলে, জলে, অন্নে ও বায়ুতে প্রাণ ধারণ করিয়া যাহারা ভারতের কুশলকে কোনও অবস্থাতেই নিজেদের বাক্য, চিন্তা বা আচরণের ত্রুটীতে বলি দিবে না, ব্যক্তিগত সুখতৃষ্ণার মায়ামরীচিকায় ভুলিয়া যাহারা দশের, দেশের ও সমাজের ব্যাপক মঙ্গলকে আঘাত করিবে না, জীবন হইবে যাহাদের সার্থক মরণ বরণ করিবার জন্য, মরণ হইবে যাহাদের সহস্র সহস্র অনাগত মানব-মানবীর সমক্ষে আত্মত্যাগের অভ্রান্ত আদর্শ প্রদর্শনের জন্য, এমন সন্তানদের জন্মদানকারী গৃহস্থকে ব্রহ্মচর্য্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরে জীবন-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

ভবিষ্যতে গৃহীই হও আর সন্ন্যাসীই হও, বীর্য্যধারণ করিতেই হইবে

আজ দেশে দলে দলে যোগ্য শিক্ষকও চাই। পাঠশালার পড়ুয়াকে রক্তচক্ষুর শাসনে আর বেত্র-প্রহারে যিনি শিক্ষাদান করেন, সেই

শিক্ষকের কথা বলিতেছি না। পুঁথিগত বিদ্যার সংস্পর্শ ছাড়িয়া যিনি নিজ উপলব্ধি-লব্ধ সত্য জ্ঞান শিষ্যের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া জগদুদ্ধার করিবেন, এইরূপ শিক্ষকের প্রয়োজন তদপেক্ষা কম নহে। মানবের নীচপথগামিনী চিত্তবৃত্তিকে টানিয়া আনিয়া ঊর্দ্ধগতিসম্পন্না করিবার জন্য যাঁহারা আপ্রাণ প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদের প্রয়োজন অত্যধিক। বস্তুতঃ সর্ব্বস্বত্যাগী পরার্থকারী সন্ন্যাসীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত শিক্ষক। যাঁহারা এইরূপ শিক্ষক হইবেন, গেরুয়ার ধ্বজা উড়াইয়া ভিক্ষা আদায় করিবার জন্য নয়, পরন্তু বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া চিরিয়া দিয়া যাঁহারা মানব-শিশুর মনে মহত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবেন, তাঁহাদেরও প্রাণপণ যত্নে বীর্য্যধারণ করিতে হইবে। কারণ, বীর্য্যক্ষয়িষ্ণু পিতার সন্তান যেমন সবল হয় না, তপঃশক্তিহীন গুরুর শিষ্যও তেমন তেজস্বী হয় না। পুনশ্চঃ বীর্য্যধারণ না করিলে তপঃশক্তিও সঞ্চিত হয় না।

তোমরা আজ অসংযমের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছ। ঘোড়-দৌড়ের প্রতিযোগিতার ন্যায় তোমরা আজ যেন সবাই মিলে জিদ্ করিয়া কে আগে ধ্বংসের কবলে গিয়া গড়াইয়া পড়িতে পার, তজ্জন্য উন্মত্ত আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছ। যে বিষয়ে যার তার মুখে জ্ঞান সঞ্চয় করা তোমাদের উচিত ছিল না, নানা প্রকারে তাহাই করিয়া অবৈধ কৌতূহলের ফলে তোমরা দিনের পর দিন নরকের পথকে পরিষ্কার করিতেছ। কৌতুকপ্রিয় ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, জামাইবাবু এবং দাদার শ্যালক প্রভৃতি আত্মীয়েরা নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ, রঙ্গ-পরিহাস ও অশ্লীলতাদুষ্ট রহস্যালাপের মধ্য দিয়া অপরিণত বয়সেই তোমার মনোমধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তির ভাব জাগাইয়া দিয়াছেন। তুমি

আজ জননীর জাতিকে জননীর মত দেখিতে জান না, সহোদরা-প্রতিমাদের প্রতি ভ্রাতার যোগ্য নির্ম্মল ভাব পোষণ করিতে পার না। অপ্রাপ্ত বয়সেই কখনও কোনও অসতর্ক গুরুজন, কোনও স্খলিত-চরিত্র বিদ্যালয়ের বন্ধু কিম্বা বাড়ীর অমার্জ্জিতরুচি ধাত্রী, ঝি-চাকরাণী অথবা চাকর-বাকরের মুখে নানাবিধ কলুষিত কাহিনী অথবা পঙ্কিল সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তোমার চিত্তবৃত্তি দূষিত হইয়া গিয়াছে। ফলে উৎকৃষ্ট পরমার্থ-সঙ্গীতেরও কুব্যাখ্যা করিয়া তুমি আজ আমোদ পাও, শ্রেষ্ঠ মানবের জীবন-লীলার নিষ্কলঙ্ক অংশ-মধ্যেও একটা অশ্লীলতার আরোপ করিয়া খুশী হও। কুৎসা শুনিতে কত সুখ, কুৎসা প্রচার করিতে কত তৃপ্তি। কোথায় দুইটা আদিরস-পূর্ণ কথা শুনা যাইবে, এই জন্য তুমি আজ উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছ। তোমারই গুরুজনদিগকে বাসর-ঘরে বরকন্যাসহ অসঙ্গত রঙ্গরস করিতে শুনিয়া, ব্যবসাদারী থিয়েটারে ও কুরুচি-কলঙ্কিত বায়স্কোপে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের শালীনতা-বর্জ্জিত নির্লজ্জ নৃত্য দেখিয়া তোমার মনোবিভ্রম ঘটিয়াছে। ফলে, তুমি আজ দিবারাত্রি শুধু রঙ্গীণ স্বপ্নই দেখিতেছ, আহারের সময়ে আহার্য্যে মন নাই, অধ্যয়নকালে পুস্তকে মন নাই, দিবানিশি কুচিন্তা করিয়া শুধু অধঃপাতেই যাইতেছ, শুধু দুর্ভাগ্যই কুড়াইতেছ। ইতর জন্তুর যৌন সম্মিলন দেখিতে দেখিতে এবং বয়স্ক ও বকাটে সহক্রীড়ক বা সহপাঠীদের কামবিষয়ক অভিজ্ঞতা শুনিতে শুনিতে তোমার রক্ত-মাংসের ক্ষুধা অকালে অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে, আর, সেই কামানলের ইন্ধন যোগাইতেছেন—বর্ত্তমান যুগের শিল্পচতুর ঔপন্যাসিক, আদিরসিক কবি ও তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক চিত্রকর। ইহারা নিজেদের

অকাল কামোদ্রেকের কারণ-নিচয়

ব্যর্থতা-বিড়ম্বিত কামকলুষিত জীবনের গোপন ছবিগুলিই যেন সু-রসাল সাহিত্য বা কমনীয় কবিত্বের দোহাই দিয়া তোমাদের নিকটে পরিবেশন করিয়া যাইতেছেন এবং নিজেদের পাপের প্রভাব সমগ্র জাতির মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতেছেন। অগঠিত হৃদয়মন লইয়া তোমরা এই সকল উত্তেজক চিন্তাকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছ না, দিনের পর দিন তোমাদের কামাকৃতি নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর করিতেছ কি ? যৌবনের প্রথম সন্ধিক্ষণে, অমৃতত্বের প্রথম ঊষায় যখন তোমার দেহ ও মন মাত্র ক্রমবিকাশের পথে পদার্পণ করিয়াছে, তখনই তুমি মস্তিষ্ক ও জননযন্ত্রাদির পরিণত বিকাশে বাধা দিয়া অবৈধ ও কৃত্রিম উপায়ে বীর্য্যক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছ। যাহা শক্তি-সামর্থ্য, শৌর্য্য-বীর্য্য, মেধা-মনীষা, উৎসাহ-উদ্যম, আয়ু এবং আরোগ্যের মূল কারণ, যাহা দেহের যাবতীয় পেশী, তন্তু এবং স্নায়ুর দৃঢ়তা-সম্পাদক, শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক গঠনের যাহা অপরিহার্য্য উপাদান, ক্ষণিক সুখের লোভে তাহারই অপব্যয় করিতেছ, কাঞ্চনের মূল্যে কাচ কিনিতেছ, নিত্যসুখের বিনিময়ে মৃত্যু সঞ্চয় করিতেছ।

তোমাদিগকে আজ এই মুহূর্ত্ত হইতেই ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় রুদ্ধ করিতে হইবে এবং যাহাতে নিদ্রাবিকারে বা মূত্র-সহযোগে অনিচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় আর কিছুতেই না হইতে পারে তজ্জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। কুচিন্তা করিয়া প্রতিনিয়ত মনের স্থৈর্য্য ও পবিত্রতা নাশ করিতেছ, আজ এই মুহূর্ত্তেই প্রতিজ্ঞা কর যে, মনকে আর ইহজীবনে একবারের জন্যও কলুষিত হইতে দিবে না। কুকথা কহিতে কতই না আগ্রহ অনুভব করিতেছ কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই

আজই সুদৃঢ় সঙ্কল্প কর, বীর্য্যক্ষয় করিবে না, বিপথে যাইবে না

তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, নারকীয় প্রসঙ্গে জিহ্বাকে আর বিষ্ঠা-প্রলেপিত করিবে না। কুদৃশ্য দেখিতে বড়ই কৌতূহল অনুভব করিতেছ কিন্তু তোমাকে আজ এই মুহূর্ত্তেই সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে যেন কিছুতেই নয়ন অস্থানে অপাত্রে ধাবিত হইতে না পারে। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে, শরীরের প্রত্যেকটী মাংসপেশীকে সামরিক কর্ম্মচারীর ন্যায় একেবারে সর্ব্বদার তরে আজ্ঞাবহ রাখিবার জন্য মৃত্যু-সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্মপরায়ণ হও। কারণ, যদি যৌবনের এই মহাযুদ্ধে ইন্দ্রিয়ের উপরে তোমার বিজয় ঘোষিত না হয়, এখনই যদি অসংযমের উপরে তোমার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ত' তোমার আর কল্যাণ নাই বাছা। তাই আজ তোমাকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই প্রাণান্ত করিতে হইবে।

বীর্য্য যে কত কারণে কত ভাবে ক্ষরিত হইয়া থাকে, তাহা কি জান? জানিলে আর কুচিন্তা করিবার রুচি থাকিবে না, কুকথা কহিতে ভাল লাগিবে না, অন্তরাল হইতে উঁকি দিয়া রমণীর রূপ দেখিবার সাধ থাকিবে না। কারণ, অণ্ডকোষদ্বয়ের মধ্যে রক্ত হইতে শুক্রকে নিকাশন করিয়া আনিবার যে বিচিত্র কারখানাটী ভগবান্ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, বিন্দুমাত্র কামভাবের উদ্দীপন হইতে-না-হইতে তন্মুহূর্ত্তেই সেখানে সকলের অলক্ষ্যে বিরাট কর্ম্ম-কোলাহলের সৃষ্টি হইয়া যায় এবং অতি দ্রুত শুক্র-কণাসমূহ শুক্র জমা থাকিবার ভাণ্ডারে অর্থাৎ শুক্রকোষে যাইতে থাকে। স্বাভাবিক গতিতে যখন তোমার গৃহে কোনও অভ্যাগত সমাগম হন, তখন কি তুমি উত্তেজিত হও? কিন্তু অস্বাভাবিক দ্রুততা সহকারে যখন কেহ তোমার গৃহে প্রবেশ করে, তখন তুমি উত্তেজিত হইয়া থাক। স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে শুক্র-কণিকাসমূহ যখন অণ্ডকোষ হইতে শুক্রকোষের

দিকে যাইতে থাকে, তখন অল্পাধিক কতকটা উত্তেজনা শুক্রকোষের মধ্যে হইতে থাকে। উত্তেজনার পরিমাণ অতি অল্প হইলেও বারংবার উত্তেজিত হইতে হইলে তোমার যেমন তিরিক্ষি মেজাজ হইয়া যায়, শুক্রকোষের অবস্থাও তাহাই। তুমি বারংবার কুচিন্তায়, কুকথায় বা কদর্য্য কাজে রত হইলে বারংবার অণ্ডকোষদ্বয়ের শুক্র-তৈরী করার স্বাভাবিক দ্রুততা অপেক্ষা অনেক বেশী দ্রুততায় শুক্রকোষদ্বয়ে শুক্র পৌঁছিয়া পর পর বহুবার সেখানে উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি করে। ফলে তাহাদের মধ্যে এমন একটা অসহিষ্ণুতার প্রবণতা সৃষ্ট হইয়া যায় যে, সাধারণ ক্ষেত্রে যে সকল তুচ্ছ উত্তেজনা ঘটিলে শুক্রকোষদ্বয়ের আকুঞ্চন ঘটিয়া শুক্রক্ষয় হওয়া সম্ভব নহে, তোমার ক্ষেত্রে শুক্রক্ষয় ঘটাইবার পক্ষে তাহাই হয়ত যথেষ্ট। ফলে সামান্য মনশ্চাঞ্চল্যে বা নগণ্য দৈহিক অসতর্কতায় তোমার কিছু-না-কিছু বীর্য্য স্বস্থানভ্রষ্ট হইবেই এবং তোমাকে উত্তরোত্তর দুর্ব্বল করিবেই। এই জন্যই আমি তোমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া থাকি,—

আত্মসুখ ইচ্ছামাত্র বীর্য্য অপচয়,
বিশ্বসুখ চিন্তামাত্র আনন্দ-উদয়।

তোমার দেহমধ্যে যতগুলি যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আছে, তন্মধ্যে নাভি হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত যেগুলি রহিয়াছে, তাহাদের সুস্থতা বা অসুস্থতার উপরে বীর্য্যধারণ বা বীর্য্যক্ষয় খুব বেশী নির্ভর করে। ঊর্দ্ধ অঙ্গে

বীর্য্যধারণ এবং বীর্য্যক্ষয়ের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ

একমাত্র মস্তিষ্ক ব্যতীত অপর কোনও যন্ত্রের সহিত বীর্য্যক্ষয়ের এত গুরুতর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর নাই। শরীরের মধ্যে যতগুলি স্নায়ু আছে, তাহাদের মূল-কেন্দ্র মস্তিষ্কে। কতকগুলি স্নায়ু শরীরের সর্ব্বস্থান হইতে

সংবাদ বহন করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় এবং কতকগুলি স্নায়ু মস্তিষ্কের আদেশ বহন করিয়া নিয়া বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করে। যেমন ধর, কোথাও সঙ্গীত হইতেছে, গীত-বাদ্যের ধ্বনি-তরঙ্গ তোমার কর্ণপটহে আসিয়া আঘাত করিল। কর্ণপটহে যে সকল সংবাদবাহী স্নায়ুর সংযোগ আছে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ টেলিগ্রাফের ন্যায় নিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দিল। মস্তিষ্কে সংবাদ পৌঁছামাত্র তোমার এই অনুভূতি জন্মিল যে, কোথাও সঙ্গীত-চর্চ্চা হইতেছে। মনের সহিত মস্তিষ্কের বড় সখ্য-সম্বন্ধ, তাই এই অনুভূতি জন্মিবার সাথে সাথেই তুমি সঙ্গীতের প্রতিকূলে বা অনুকূলে চিন্তা আরম্ভ করিলে। অতি অল্প সময় মধ্যেই তুমি নানা যুক্তি-বিচার-বিতর্কের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে, এই সঙ্গীত মধুর কি কর্কশ, ইহা শ্রবণযোগ্য কি অশ্রাব্য। মন যদি বলিল, তোমার শুনাই উচিত, ভাল হউক, মন্দ হউক, না শুনিলেই তোমার চলিবে না, তখন তোমার মস্তিষ্ক হুকুম জারি করিয়া বসিল,—"চল ঐখানে।" আর আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর দল আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। ফলে, তোমার পদযুগল চলিতে চলিতে তোমাকে একেবারে গানের বৈঠকে আনিয়া ফেলিল। আবার তোমার মন যদি বলিল, শুনিয়া কাজ নাই, অন্য কাজ নষ্ট করিয়া গান শুনিয়া সময়-রত্ন হেলায় হারান যাইতে পারে না, অথবা হাতে সময় থাকিলেও, বিনা পয়সায় পাইলেই যেমন আফিং খাওয়া যাইতে পারে না, বিনা খরচে শুনিবার সুযোগ হইলেই তেমন যা'-তা' জায়গায় গিয়া যার-তার মুখের যা-তা গান শুনিয়া চিত্তের স্থিরতা ও পবিত্রতা এবং সংসর্গের বিশিষ্টতা নাশ করিতে পার না,—

তখনই তোমার মস্তিষ্ক হইতে আদেশ নির্গত হইল,—"ফির এখান হইতে।" আর, আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর দল তখনই তোমার চক্ষুদ্বয়ের গতি অন্য দিকে সঞ্চালিত করিয়া দিল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা মনের বহিশ্চক্ষু, আর সংবাদবাহী স্নায়ুগুলি তাহার টেলিগ্রাফের তার। মস্তিষ্ক মনের প্রকাশ-যন্ত্র। এই যন্ত্রমধ্যে মনের যাবতীয় ক্রিয়াশীলতার লীলাখেলা চলিতেছে। চক্ষু দৃশ্য দেখিলে, কর্ণ কথা শুনিলে, নাসিকা গন্ধ পাইলে, জিহ্বা আস্বাদন পাইলে, ত্বক্ বস্তুস্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বার্ত্তা মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তাহার ফলে দেহের যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্যধারা মস্তিষ্ক হইতে নির্ণীত হয়। মোট কথা, যাবতীয় অঙ্গপ্রবৃত্তির মূলই হইল মস্তিষ্ক। যে মুহূর্ত্তে তোমার মনে কামচিন্তা জাগে, তন্মুহূর্ত্তে মস্তিষ্ক শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীকে এমন ভাবে চলিতে আদেশ দেয়, যাহাতে দেহের রক্তস্রোত অধোগামী হইয়া জননেন্দ্রিয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং তাহাকে স্ফীত, দৃঢ় ও উত্তেজিত করিয়া তোলে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সন্নিকটবর্ত্তী বিশেষ বিশেষ যন্ত্রগুলির মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে, যাহাতে সূক্ষ্ম বা প্রত্যক্ষ বীর্য্যক্ষয় সম্ভব হইয়া পড়ে।

সেই বিষয় বিস্তারিত বুঝাইতে হইলে, সেই যন্ত্রগুলির সংস্থান এবং কার্য্যকরী শক্তি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হইবে। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া পড়িও।

মস্তিষ্কের (Brain) একটা অংশ সাপের লেজের আকারে প্রসারিত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া তাহার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া

জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনার কারণসমূহ

আসিয়াছে। ইহাকে ডাক্তারী শাস্ত্রে মেরুস্নায়ু (Spinal Cord) বলা হয়। যোগাচার্য্যেরা এই পথেই সুষুম্না নাড়ীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নোদরের যে স্থান যৌবনাবস্থায় লোমাবৃত থাকে, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে এই মেরুস্নায়ু হইতে অনেকগুলি স্নায়ু বাহির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি একত্র মিলিত হইয়া একটা স্নায়ুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে বলা হয় রতিস্নায়ু। এই রতিস্নায়ুর বহু শাখা ও প্রশাখা জননেন্দ্রিয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্ক হইতে

রতিস্নায়ু

মেরুদণ্ড ও রতিস্নায়ুর মধ্যবর্ত্তিতায় যে শক্তি-প্রবাহ জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি যন্ত্রে প্রেরিত হয়, তাহাই অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে সবেগে রক্তস্রোতের প্রাবল্য ঘটাতে জননেন্দ্রিয়ের উত্থানশীল পেশীসূত্রগুলি দৃঢ় ও উত্তেজিত হইয়া উঠে।

জননেন্দ্রিয় প্রধানতঃ উত্থানশীল পেশীসূত্রসমূহ দ্বারাই গঠিত। এই জন্যই জননেন্দ্রিয়ে কখনও হস্ত, বস্ত্র বা অপরাপর বস্তুর প্রগাঢ় স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তেজনা হয়। এই কারণেই জননেন্দ্রিয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে-কোনও যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈষম্য, অবসাদ বা উত্তেজনা ঘটিলে জননেন্দ্রিয়ও উত্তেজিত হয়। যেমন ধর, তোমার মূত্রস্থলী ও মলাধার। মূত্রস্থলী মূত্রে ও মলাধার মলে পরিপূর্ণ হইবার

মলাধার, মূত্রাধার ও ক্রিমি

পরে মলমূত্র বহির্গমনের পথ না পাইলে ঘার ঘার স্থলীতে উত্তেজনার সঞ্চার করে, ফলে জননেন্দ্রিয়েও ঘন ঘন উত্তেজনা হইতে থাকে। এই জন্যই মলবেগ ও মূত্রবেগ

ধারণ করিতে নাই, মলমূত্রের বেগ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে মলমূত্র ত্যাগ করা ভাল। মস্তিষ্ক, মেরুস্নায়ু, পাকস্থলী প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ। গুহ্যদ্বারে ক্রিমির উপদ্রব বেশী হইলে তাহা হইতেও জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই মলত্যাগের পর মূল-শোধনী মুদ্রা করা ভাল। জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে যে আচ্ছাদনী ত্বক্ রহিয়াছে, তন্মধ্যস্থ অংশ পরিষ্কৃত না থাকিলে কীটাদি উৎপন্ন হইয়া চুলকণা জন্মাইতে পারে এবং উত্তেজনা ঘটাইতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণেই হয়ত কোনও কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ধার্ম্মিক কর্ত্তব্য হিসাবে বাল্যকালেই পুরুষের লিঙ্গত্বক্‌চ্ছেদন করেন। এই কারণেই প্রতিবার মূত্র ত্যাগের পরে এবং স্নানের সময়ে প্রচুর জল দ্বারা লিঙ্গ ধৌত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

জননযন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটি নয়, দুইটি নয়, অসংখ্য রক্তবহা শিরা এবং উপশিরা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একদল শিরা ও উপশিরা (Arteries) হৃৎপিণ্ড হইতে প্রেরিত দেহমধ্যস্থ রক্ত পুরুষাঙ্গে প্রেরণ করে, অপর দল শিরা (Veins বা ধমনী) সেই রক্তস্রোতকেই অন্য পথে পুরুষাঙ্গ হইতে বাহির করিয়া পুনরায় পরিশোধনের জন্য দেহমধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডে পাঠাইয়া দেয়। যে সকল শিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত পুরুষেন্দ্রিয়ে প্রেরিত হয়, কোনও প্রকার চাপ বা আঘাত নিবন্ধন

পুরুষাঙ্গের শিরা ও ধমনীসমূহ

যদি তাহাদের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে রক্তের অভাব বশতঃ পুরুষাঙ্গ শুষ্ক, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পরন্তু যে সকল শিরা অর্থাৎ ধমনী দ্বারা রক্তস্রোত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য নিরন্তর

পুরুষেন্দ্রিয় হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, কোনও প্রকার চাপ বা আঘাত বশতঃ যদি তাহাদের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, তবে অতিরিক্ত রক্তের পোষণে উপস্থ উত্তেজিত, উন্নমিত, বৃহদাকার ও কঠিন হইয়া উঠে।

উপস্থের যতটুকু অংশ নিম্নোদরের বাহিরে রহিয়াছে, ঐটুকুই উহার সব নহে। বাহিরের ন্যায় ভিতরেও উহার একটা অংশ রহিয়াছে। বাহিরের সমস্তটা অংশই মূত্রপথ। আভ্যন্তরীণ অংশ পাশাপাশি তিনটী ভাগে বিভক্ত। মধ্যবর্ত্তী অংশ মূত্রনালী বা মূত্রপথই (Urethra) বটে। এই অংশ মূত্রস্থলী এবং শুক্রকোষ এই উভয় ভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত। মূত্রস্থলীতে উপযুক্ত পরিমাণ মূত্র সঞ্চিত হইলে এই পথেই উহা বহির্গত হয়। শুক্রকোষে যতটুকু শুক্র ধরিবার স্থান আছে, তাহা হইতে অধিক শুক্র সেখানে জমা হইতে থাকিলে বা শুক্রকোষে কোনও উত্তেজনা-জনিত আকুঞ্চন চলিলে এই পথে শুক্রও বহির্গত হইয়া আসে। জননেন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরীণ অপর দুই অংশ (Crus Penis বা যোনিলিঙ্গ) পুরুষাঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এই স্থানকে যোগীরা যোনিমণ্ডল বলেন। এইজন্য মূত্রনালীর দুই পার্শ্ববর্ত্তী লিঙ্গাংশদ্বয়কে যোনিলিঙ্গ নামে অভিহিত করিলাম। এই যোনিলিঙ্গদ্বয় এক প্রকার কুঞ্চনশীল পেশী (Erector Penis) দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। পুংযন্ত্রের উত্তেজনা

যোনিলিঙ্গ ও জননেন্দ্রের কুঞ্চনশীল পেশীদ্বয়

উপস্থিত হইলে, এই কুঞ্চনশীল পেশীদ্বয় নিজ নিজ গাত্র কুঞ্চিত করিয়া বিপরীত দিক্ হইতে যোনিলিঙ্গদ্বয়কে সজোরে চাপিয়া ধরে। ফলে যে ধমনীগুলির মধ্য দিয়া রক্ত-প্রবাহ জননেন্দ্রিয় হইতে বহির্গত হইয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য দেহমধ্যে পরিগৃহীত হয়, সেই ধমনী-

গুলিতে চাপ পড়িয়া রক্তের বহির্নির্গম অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, অথচ যে সকল শিরার মধ্য দিয়া রক্তস্রোত পুরুষেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, তাহারা এই চাপ হইতে সম্যক্ মুক্ত থাকে। ফলে, কামচিন্তার বা কামক্রিয়ার আধিক্যের সাথে সাথে পুংযন্ত্রে রক্তেরও ক্রমাগত আধিক্য হইতে থাকে এবং উত্তরোত্তর উত্তেজনার পরিমাণ বাড়াইতে থাকে। উত্তেজনা যখন শেষ সীমায় পৌছে, তখন চঞ্চলীকৃত শুক্র আর শুক্রকোষ-মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ঠিকরিয়া আসিয়া মূত্রনালী-(Urethra)র মুখে পৌছে এবং কামগ্রন্থি (Prostate Gland) হইতে নিঃসৃত তরল রসের সহিত মিশিয়া তরলীকৃত হইয়া সবেগে দেহের বাহিরে পড়ে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত (Erector-penis)-দ্বয়ের চাপ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রক্তস্রোত জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশের সাথে সাথে বাহির হইবার পথ খোলা পায় না বলিয়াই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে। কুঞ্চনশীল পেশীদ্বয়ের শৈথিল্য সম্পাদিত হইলেই ধমনীগুলির উপর হইতে চাপ কমিয়া যায়। ফলে রক্তের বহির্নির্গমের পথ খুলিয়া যায় সুতরাং উত্তেজনাও আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়।

জননেন্দ্রিয়ের যে অংশের দ্বারা মূত্র বহির্গত হয়, তাহাকে মূত্রনালী বা Urethra বলে। মূত্রস্থলী এবং মূত্রনালী যে স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানকে বেষ্টন করিয়া কামগ্রন্থি (Prostate Gland) অবস্থিত। তেঁতুলের কথা মনে পড়িলেই আপনা-আপনি যেমন রসনা জলসিক্ত হয়, মনেও তেমনি কোনও কামভাবের উদয় হওয়া মাত্রই এই কামগ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস অল্প অল্প নিঃসৃত হইয়া সমগ্র মূত্র-পথকে পিচ্ছিল করিয়া দেয়,—যেন সহজেই শুক্র বাহির হইয়া

কামগ্রন্থি

যাইতে পারে। কামবেগহেতু শুক্রের যখন বহির্নির্গম হইবে, তখন এই কামগ্রন্থি হইতে আরও কতকটা রস নিঃসৃত হইয়া তাহাকে তরল করিয়া দেয়। শুক্র সমগ্র শরীরব্যাপী শোণিত-রাশির সহিত অবস্থান কালে দুগ্ধমধ্যস্থ মাখনের ন্যায় অদৃশ্য, শুক্রকোষে আসিয়া অবস্থান-কালে গাঢ়, ঘন, ক্ষীরবৎ। উত্তেজনা-হেতু শুক্রকোষ হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া মূত্রনালীর মুখে স্খলিত হওয়া মাত্র কামগ্রন্থির তরল রস তাহাতে মিশ্রিত হওয়ার দরুণ তাহা মূত্রনালী দিয়া সহজে নির্গত হইয়া যায়।

উপস্থের প্রকৃত মূল এই কামগ্রন্থি। যোগীরা এই স্থানেই স্বাধিষ্ঠান নামক চক্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

শুক্র মূত্রপথ দিয়া বহির্গত হইবার পূর্ব্বে শুক্রকোষদ্বয়ে (Seminal Vesicles) অবস্থান করে। কামগ্রন্থি যে মূত্রস্থলী ও মূত্রপথের সংযোগস্থলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা আগেই বলিয়াছি। এই কামগ্রন্থির উপরাংশের পশ্চাদ্ভাগের দুই পার্শ্বে শুক্রকোষদ্বয় অবস্থিত।

শুক্রকোষদ্বয়

এই কোষদ্বয় দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় ইঞ্চির মত এবং মৌমাছির চাকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীতে বিভক্ত। প্রত্যেকটী অণ্ডকোষ হইতে এক একটী অতি ক্ষুদ্র নল বহির্গত হইয়া এই শুক্রকোষদ্বয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। শুক্র অণ্ডকোষে উৎপন্ন হইয়া এই দুইটী নলের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া শুক্রকোষে সঞ্চিত হয়। কামোত্তেজনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, বেগ যখন অসহনীয় হইয়া উঠে, শুক্রকোষ দুইটি তখন হঠাৎ সজোরে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ কুঞ্চিত হইতে থাকে। ফলে, মৌচাকের কুঠরীর ন্যায়

শুক্র কুঠরীগুলি হইতে শুক্র প্রবলবেগে নির্গত হইয়া মূত্রনালীতে পতিত হয় এবং কামগ্রন্থি-নিঃসৃত রসের সহযোগে তরলতর হইয়া দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

শুক্রধাতু দেহের রসরক্তাদি সপ্তধাতুর সার পদার্থ। ইহা শরীরের সমগ্র রক্ত-রাশির সহিত মিশ্রিত থাকে। দুগ্ধ মধ্যে মাখন যেমন ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে, শরীরের সারভূত বীর্য্যও তেমনি রক্তের সহিত একেবারে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশিয়া থাকে। মন্থনের ফলে যেমন দুগ্ধ হইতে মাখনটুকু পৃথক্ হইয়া আসে, দৈহিক স্নায়ুমণ্ডলীর অস্বাভাবিক এবং অত্যধিক উত্তেজনাহেতু রক্তপ্রবাহ অণ্ডকোষের দিকে ধাবমান হইলেও তেমনি অণ্ডকোষদ্বয় রক্ত হইতে দেহের সারভূত পদার্থটুকুকে পৃথক্ করিয়া লইতে এবং শুক্রকোষে পাঠাইতে থাকে।

সপ্তধাতুর সার শুক্র এবং অণ্ডকোষদ্বয়

পুরুষেন্দ্রিয়ের উপযুক্ত উত্তেজনা জন্মিবার কোনও কারণ ঘটিলেই এই প্রাণরূপী শুক্র শুক্রকোষ হইতে সজোরে বহিঃক্ষিপ্ত হইয়া দেহভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং বারংবার এইরূপ ঘটিতে থাকিলে ক্রমশঃ বল, বুদ্ধি ও মেধার বিনাশ সাধন করিয়া দেহ এবং মনকে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও অকল্যাণের আকর-স্বরূপ করিয়া তোলে। ইন্দ্রিয়-পরিচালন বা ইন্দ্রিয়-সুখ-চিন্তার দরুণ অণ্ডকোষে যত রক্তের অধিক গতায়াত হইবে, রক্ত হইতে শুক্রও তত অধিক পরিমাণে পৃথক্কৃত হইবে এবং রক্ত হইতে অণ্ডকোষদ্বয়ের দ্বারা যতই অধিক পরিমাণে শুক্র মথিত হয়, শুক্রকোষে আসিয়া ততই অধিক পরিমাণে শুক্র ব্যয়ার্থে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং শুক্রকোষ হইতে যতই অধিক পরিমাণে তাহা বর্জ্জিত হইয়া যায়, সমগ্র

দেহের রক্তরাশি তত নিস্তেজ, মলিন, বিবর্ণ, রোগ-বীজাণুর ক্ষমতা-দমনে অসমর্থ ও ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়ে। ফলে শরীরের যতগুলি স্নায়ুর মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়, সবগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রক্ত-বিশোধনের যন্ত্র হৃৎপিণ্ড দিনের পর দিন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া যাইতে থাকে।

দেহে বা মনে যখন অত্যধিক কামোত্তেজনা বা কামভাব চলিতে থাকে, তখন অণ্ডকোষদ্বয় তেমন করিয়া রক্ত হইতে অত্যধিক পরিমাণ শুক্র পৃথক্ করিয়া করিয়া কেবল শুক্রকোষে চালান দিতে থাকে, যেমন করিয়া বর্ষার জোয়ারে চাঁদপুর ও গোয়ালন্দের মৎস্য-ব্যবসায়ীরা অত্যধিক সংখ্যায় ইলিশ মাছ আসাম বা কলিকাতায় চালান দেয়। আসামের বা কলিকাতার লোকের ইলিশ মাছ খাইবার সামর্থ্যের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে ; চেষ্টা দ্বারা সেই সামর্থ্যের পরিমাণ বাড়ান যায়, কারণবশতঃ তাহা কমিতেও পারে। যখন যতগুলি ইলিশ মাছ খাইবার সামর্থ্য আসামের বা কলিকাতার লোকের আছে, তাহা অপেক্ষা যদি বেশী ইলিশ মাছ চালান যাইতে থাকে, তাহা হইলে এই সুস্বাদু ইলিশ মাছ মানুষের শরীরে জীর্ণ ও পরিগৃহীত না হইয়া আস্তাকুড়েতে নিক্ষিপ্ত হয়। ঠিক তেমন শুক্র-কোষদ্বয়েরও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সামর্থ্য আছে, যাহা দ্বারা অণ্ডকোষদ্বয় হইতে প্রেরিত কতকটা করিয়া শুক্র সে প্রত্যহ নিজেই শোষণ করিয়া লইতে পারে এবং যোগীরা বলেন, শুক্রকোষদ্বয় শুক্রকে শোষণ করিয়া যতটা পরিমাণে সমগ্র দেহে ছড়াইয়া দিতে পারে, শরীর-মধ্যে ততটা ওজঃ-সঞ্চারিত হয়। দৈনিক যতটা শুক্রকে শোষণ করিয়া পুনরায় দেহমধ্যে প্রেরণের সামর্থ্য শুক্রকোষের আছে, অণ্ডকোষদ্বয় যদি তাহা অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে শুক্র শুক্রকোষে প্রেরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে কিছু কিছু জমিয়া ক্রমশঃ শুক্রকোষদ্বয় শুক্রে ভরিয়া যায় এবং পূর্ণ কলসীতে সামান্য ধাক্কা লাগিলেই যেমন জল উছলিয়া পড়ে, তেমনি সামান্য শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনাতেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শুক্র স্খলিত হইয়া পড়ে। যে কলসীতে জল অল্প, তাহাতেও অসামান্য ওলট-পালট ঘটিলে তাহার জল উছলিয়া পড়ে। তেমনি যখন শুক্র-কোষদ্বয়ে অত্যধিক পরিমাণ শুক্র আসিয়া জমিয়া নাই, তখনও অত্যধিক উত্তেজনার কারণ চলিতে থাকিলে শুক্র স্খলিত হইয়া যায়। কোনও বৃক্ষের মূলদেশে যদি বহু সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটী কলসী বসান যায় এবং এই কলসীটীর যদি এমন ক্ষমতা থাকে যে, যখনই ইহাতে যত জল ঢালা যাউক না কেন, কলসীটী তাহা বৃক্ষমূলে নিয়া পৌছাইয়া দেয়, তাহা হইলে এই কলসী হইতে কোনও অবস্থাতেই জল উপচাইয়া পড়িবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। ঠিক তেমনি অণ্ডকোষদ্বয় হইতে যখনই যত শুক্র শুক্রকোষদ্বয়ে প্রেরিত হউক না কেন, যে ব্যক্তির শুক্রকোষদ্বয় স্বাভাবিক শক্তিতে বা অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ যৌগিক শক্তিতে বা অলৌকিক ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার সবটাই ওজোরূপে পুনরায় শরীর মধ্যেই পরিপ্রেরণ করে, তেমন ব্যক্তির শুক্রক্ষয় হয় না।

ইহাই হইল শুক্রক্ষয়-সম্বন্ধীয় মোটামুটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যৌগিক সত্য। প্রথমবারেই ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পার, কয়েকবার এই অংশটুকু ভাল করিয়া পড়িয়া লইও। তাহা হইলে বীর্য্যক্ষয়ের প্রতিকারের উপায়গুলি বুঝিয়া লইতে কষ্ট হইবে না।

শুক্রক্ষয়কে সম্যক্ নিবারণের জন্য ভারতীয় যোগীরা দুইটী প্রধান বিষয় লক্ষ্যে রাখিয়া সাধন করিয়াছেন। অণ্ডকোষদ্বয় হইতে অত্যধিক শুক্র শুক্রকোষদ্বয়ে না যাইতে পারে, একদল সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নানা যৌগিক কৌশলের অনুশীলন করিয়াছিলেন। অণ্ডকোষ যদি রক্ত হইতে শুক্রকে পৃথক্ করিবার কাজ ছাড়িয়া দেয় বা অণ্ডকোষ হইতে শুক্রকোষে শুক্রকে প্রেরণের জন্য সৃষ্ট শুক্রবাহী সূক্ষ্ম নল দুইটীই যদি ছিন্ন হইয়া যায় বা শরীর হইতে অণ্ডকোষ যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে পুরুষত্ব, তেজ, বীর্য্য, উৎসাহ, কর্ম্মঠতা প্রভৃতিও থাকে না। তাই অণ্ডকোষের অস্তিত্ব এবং তাহার পূর্ণস্বাস্থ্য বজায় রাখিয়াই তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা হইবার পথ খুঁজিয়াছেন। অপর দল প্রধানতঃ লক্ষ্য দিয়াছেন শুক্রকোষদ্বয়ের শুক্রধারণী ক্ষমতাকে বর্দ্ধিত করিবার দিকে। প্রথমোক্ত যোগীদের আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সুখ-গোমুখাসনের নাম করা যাইতে পারে। শেষোক্ত যোগীদের আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত সন্দীপনী-মুদ্রা। পরবর্ত্তী কালে এই উভয় পন্থা একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঘেরণ্ড-সংহিতাদি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থের রচনা তাহার পরে হইয়াছিল।

কিন্তু একটী কথা। শুক্রক্ষয়ের দেহতত্ত্ব এবং শুক্রধারণের যৌগিক লক্ষ্য জানিলেই শুক্রক্ষয় নিবারিত হইবে না,—যদি রিপুদমনের জন্য তোমার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রবল উদ্যম না থাকে। জানা এক কথা, আর, জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য-সম্পাদন আর এক কথা। জগতে কত দুর্ভাগা নরনারী যত্ন করিয়া কত মঙ্গলজনক বিষয়ে কত জ্ঞানই না আহরণ করিল এবং আলস্যভরে ঔদাস্যবশে জ্ঞানানুযায়ী সদাচার পালন হইতে নিজেকে সুদূরে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিল। ফল ফলিল এই

যে, রসনা তাহাদের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে কত কলভাষণেই মুখর হইল কিন্তু জ্ঞানামৃতের মধুময় আস্বাদন কখনই তাহারা পাইল না।—এইরূপ দুর্ভাগ্য যেন তোমার কখনও না হয়। শুধু কথা কহিয়া আর বই পড়িয়া যেন তোমার জীবন বহিয়া না যায়।

শুধু পুস্তক পাঠ করিলেই চলিবে না, তদনুযায়ী কাজ করা চাই

কথা যদি কহ, জীবন গড়িবার জন্যই মাত্র কহিও, বাচালতার জন্য নহে। বই যদি পড়, জীবন গড়িবার জন্যই পড়িও, মস্তিষ্ককে ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত করিবার জন্য নহে। চাই আত্মদমনে আগ্রহ, চাই আত্মগঠনে উৎসাহ, চাই পাপ-প্রলোভনকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য অমিত অধ্যবসায়। উদ্যমশীলতাই জীবনকে জাগাইয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট পন্থা, অলস কল্পনা অথবা বাগ্‌-বিলাসিতা নহে। জ্বলন্ত বহ্নি-শিখার মত প্রদীপ্ত কর তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে, উৎসাহের ঘৃত-নিক্ষেপে কর তাহাকে অনন্ত ঊর্দ্ধমুখী, অহর্নিশ অধ্যবসায়ে তাহার উত্তাপকে রাখ অনির্ব্বাণ।

— —

শুক্রক্ষয়ের কারণ-নিচয়

বীর্য্যক্ষয়ের কারণ ত্রিবিধ। যথা—(১) মানসিক, (২) প্রক্রিয়াগত ও (৩) বস্তুপ্রভাবজাত।

মনে মনে কাম-চিন্তা করিতেছ, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া শক্তিস্রোত তোমার প্রায় অলক্ষ্যেই জননেন্দ্রিয় এবং নিকটবর্ত্তী অপরাপর অঙ্গে প্রবাহিত হইল এবং তন্মুহূর্ত্তে জাগ্রতে বা পরবর্ত্তী কালে স্বপ্নযোগে শুক্রক্ষয় হইল,—ইহাই বীর্য্যক্ষয়ের মানসিক কারণ।

যে সকল অঙ্গের সঞ্চালনে কামোত্তেজনা জন্মে, সেই সকল অঙ্গ অবৈধভাবে বা অসতর্কভাবে পরিচালিত করিতেছ, ফলে শুক্রক্ষয় হইল,—ইহাই বীর্য্যক্ষয়ের প্রক্রিয়াগত কারণ।

যে সকল বস্তু দেখিলে, স্পর্শ করিলে, দেহে ধারণ বা আহার করিলে কামাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহাই অনায়াসে দর্শন করিতেছ, স্পর্শ করিতেছ, ধারণ করিতেছ বা আহার করিতেছ, ফলে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা ঘটিল এবং শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, বীর্য্যক্ষরণ হইল,—ইহাই হইল বীর্য্যক্ষয়ের বস্তু-প্রভাব-জাত কারণ।

বীর্য্যধারণ করিতে হইলে এই সকল কারণ ও প্রতিকারণ-সমূহ বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ কামাদিমূলক চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ অঙ্গসমূহের নিরর্থক ব্যবহার বন্ধ

করিতে হইবে। সর্ব্বশেষ, নিষিদ্ধ বস্তু-সমূহের স্পর্শ ও সহযোগ পরিহার করিতে হইবে।

কামচিন্তা দমন খুব সহজ কথা নহে সত্য, কিন্তু ইহা না করিলে যখন তোমার জীবনের কল্যাণ নাই, তখন আপ্রাণ প্রয়াসে কামকে মর্দ্দন করিবার আয়োজন করিতেই হইবে। কারণ, সাধ্যাতীত শ্রমে, শীতাতপের কঠোর উৎপীড়নে, আহার্য্য বস্তুর অপ্রাচুর্য্যে, সুনিদ্রার অভাবে, এমন কি অনেক সময় গঞ্জিকা-মদ্যাদির আসক্তিতেও একটা মানুষকে এত দুর্ব্বল, অসহায়, অকর্ম্মণ্য এবং পশুবৎ করিতে পারে না, একমাত্র কামচিন্তা তাহাকে যেমন করিতে পারে। কামচিন্তা মানুষের জীবনতন্তু খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। শ্রমক্লান্ত, অনশনক্লিষ্ট, রোগশীর্ণ, জরাজীর্ণ ব্যক্তির মধ্যেও যেটুকু মনোবল, সৎসাহস ও আত্ম-বিশ্বাস পাওয়া যাইবে, একটা তথাকথিত সুস্থদেহী কামুকের মধ্যে তাহার একচতুর্থাংশ তেজস্বিতারও আশা করিতে পার না। কামুকের চিত্ত দুর্ব্বল বলিয়াই সে দড়ি দেখিয়া সাপ ভাবে,

অসংযমের দুর্গতি

গাছের পাতা নড়িলে বাঘ দেখে, পথের চৌমাথায় ভূত দেখে, নিজের শ্বাসের শব্দে চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভয়ার্ত্ত চক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করে। কামুক মনে মনে জানে যে, সে ভগবানের বিদ্রোহী সন্তান, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া চলিলেও নিয়ত সে অনুভব করে যে, সে শয়তানের ক্রীতদাস, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে কলঙ্ক-কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া সে জন্মের পর জন্মের জন্য শুধু দুঃখ, শুধু মর্ম্মদাহ, শুধু মনস্তাপ সংগ্রহ করিতেছে। প্রত্যেকটী অসৎচিন্তা তাহার দেহের অণুপরমাণুগুলিকে হয় স্বভাবচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট, নয় স্থানচ্যুত ও কেন্দ্রভ্রষ্ট করিয়া দিতেছে,

তাই আজ তার মনুষ্যমূর্ত্তির আড়াল হইতে দেবমূর্ত্তি প্রস্ফুটিত না হইয়া পশুগুলিই যেন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তাহার ইচ্ছাশক্তি মন শ্চাঞ্চল্যের আঘাতে ও অপঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মূর্চ্ছাদশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাই আজি সে কোনও একটী মাত্র চিন্তা লইয়া দীর্ঘকাল স্থির থাকিতে পারে না কোনও একটী মাত্র কার্য্যে মৃত্যু-সঙ্কল্প লইয়া অবিচলিত নিষ্ঠায় লাগিয়া থাকিতে পারে না, কোনও একটী মাত্র আদর্শের পায়ে জীবন সমর্পণ করিয়া দিতে সে অসমর্থ। মুখে সে যাহাই বলুক না কেন, বাহিরের চটকে সে যাহাই দেখিতে চাহুক না কেন, তাহার প্রাণে সুখ নাই, মনে আনন্দ নাই, হৃদয়ে স্বস্তি নাই। অশান্তির হলাহল তাহার দেহমন নিরত জর্জ্জরিত করিয়া দিতেছে, অস্বস্তির অনলে তাহার অস্তিত্বটাই যেন দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছে। তাহার মুখমণ্ডলের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া দেখ, তাহার ললাটের কুঞ্চিত রেখাবলীর দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার হতাশাহত কোটরগত অক্ষিযুগল লক্ষ্য করিয়া দেখ, বাহিরের সাজ-পোষাকের ভড়ং ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত দারিদ্র্যের, প্রকৃত অসহায়তার, প্রকৃত দুর্ভাগ্যের প্রমাণ পাইবে। তাই বলি, আজ মনে মনে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটী কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য উদ্‌যোগ কর। আর কতকাল অবহেলায় কাটাইবে? আর কতকাল ঔদাস্যে ঔদাস্যে মৃত্যুর করাল গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে? আর কতকাল স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষদের পৌরুষ-স্পর্দ্ধিত গরিমা-গর্ব্বিত শ্রদ্ধিত জীবনের মহিমান্বিত স্মৃতিকে বিস্মৃত হইয়া জীবন্তে মহারৌরব নরক ভোগ করিবে? আজ জাগ, আজ ওঠ, আজ প্রচণ্ড বিক্রমে আত্মগঠনে ব্রতপরায়ণ হও, আজ অম্লান অধ্যবসায়-বলে যাবতীয়

কতকাল ঔদাসীন্যে কাটাইবে?

সিদ্ধি-সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়া লও,—নিজে মানুষ হও,—ভবিষ্যতের অগণিত বংশধরদের জন্য মানবযোগ্য সম্পদের সম্ভাবনা-সমূহ সৃষ্টি করিয়া যাও। বংশানুক্রমিকভাবে অসংযমের সেবা করিয়া এ জাতি ক্ষণিক সুখের বিনিময়ে যে দুর্ভাগ্যরাশি ক্রয় করিয়া পসরা ভরিয়া গৃহে বহিয়া আনিয়াছে, সংযমের আগুনে আজ সেই গোলা ভরা দুর্দ্দৈব-পুঞ্জকে ভস্মীভূত করিতে হইবে, নতুবা এ জাতির আর উদ্ধার নাই। আজ তোমরা তাহারই আয়োজন কর। তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্র প্রয়াসসমূহ পরম্পরা-ক্রমে গৃহীর সন্তান-সন্ততিতে এবং সন্ন্যাসীর শিষ্য-প্রশিষ্যে সঞ্চারিত হউক, মহামোহান্ধের মূর্চ্ছাশীর অধঃপাত-বিপন্ন জাতি মৃতসঞ্জীবন মহামন্ত্রের প্রভাবে নব-জাগ্রত হউক এবং নব-অভ্যুদয় লাভ করুক।

কামদমন কঠিন কথা বটে, কিন্তু অভ্যাস-বলে কি না হয়? অভ্যাস-বলে একলব্যের ন্যায় গুরুহীন বালকও অর্জ্জুনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাণবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে, অভ্যাসের ফলে যে-কেহ মেহারের হরিদাস বাবাজীর * ন্যায় অথবা রাজা মিথ্রিডেটসের † ন্যায় বিষ খাইয়া হজম করিতে পারে, অভ্যাসের বলে কাপুরুষাধম নর-কুল-কলঙ্কও হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ গহন কাননে বা গভীর পর্ব্বত-গহ্বরে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতে পারে। রামমূর্ত্তি বা স্যাণ্ডো একদিনে বিশ্ববিজয়ী মল্লবীর হইতে পারেন নাই, অভ্যাসের গুণেই

অভ্যাসের প্রভাব

---

* সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীসর্ব্ববিদ্যা ঠাকুরের সিদ্ধিস্থান মেহার অতি পবিত্র তীর্থ। এখানে ৪৮।৪৯ বংসর পূর্ব্বে হরিদাস বাবাজী

হইয়াছেন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব পরমযোগী অভ্যাস-প্রভাবে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পরমজ্ঞানী অভ্যাসের বলে, ভগবান্ চৈতন্যদেব পরমপ্রেমিক অভ্যাসেরই অমৃতময় ফলে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

"হে মহাবাহো! চঞ্চল মনকে আয়ত্ত করা যে অতি কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে নিরুদ্ধ করা যায়।"

নামে এক সাধু থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ ১ তোলা অহিফেন ও ১ তোলা দারমুজ (সেকোবিষ বা Arsenic) সেবন করিতেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ স্বামী নামক মাদ্রাজী সাধু কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক সি, ভি, রমনের সমক্ষে পটাশিয়াম সায়ানাইড সেবন করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, অনায়াসে সেই বিষ জীর্ণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আর একজন সাধু স্বামী পগানন্দ নাইট্রিক এসিড, পিক্‌রিক্ এসিড, ষ্ট্রীকনিন প্রভৃতি সর্ব্বজন-সমক্ষে সেবন করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন না দেখিয়া লোকে অবাক হইতেছিল।

† গুপ্তবিষ প্রয়োগের আশঙ্কায় রাজা মিথ্রিডেট্‌স্ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিষপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা-লোপ ও স্বীয় বন্দীদশা আসন্ন হইলে, বিষপান করিয়াও মৃত্যু হইল না বলিয়া শেষে ক্রীতদাসকে আদেশ দিয়া তাহার ছুরিকাঘাতে ইহাকে মারিতে হইয়াছিল।

তোমরা সুকঠোর সঙ্কল্পের সহিত অভ্যাসকে অবলম্বন কর। কিন্তু অভ্যাস কাহাকে বলে? উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠাহীন, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিহীন যেমন-তেমন একটা চেষ্টার নামই কি অভ্যাস? একটা কিছু করিতে হইবে, তাই করিলাম, এরূপ

অভ্যাস কাহাকে বলে?

মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিবার নামই কি অভ্যাস? একদিন চেষ্টা পাইয়া তিনদিন বিরত থাকার নামই কি অভ্যাস? অফুরন্ত উদ্যমই অভ্যাসের লক্ষণ, অদমিত অধ্যবসায়ই অভ্যাসের পরিচয়, সাফল্যে অখণ্ড বিশ্বাসই অভ্যাসের প্রকৃত মূর্ত্তি।

"জীবনকে গঠিত করিতেই হইবে, মরি কি বাঁচি আত্মোন্নতি লাভ করিতেই হইবে, দেবদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া তাহাকে হেলায় খেলায় অবহেলিত হইতে দিব না, মৃত্যুকেও যদি আলিঙ্গন করিতে হয়, তথাপি মনুষ্য-জন্মের পরিপূর্ণ সার্থকতা আমাকে সম্পাদন করিতেই হইবে,"—এই জিদ্ রাখিয়া কর্ম্মাঙ্গনে

উৎসাহই শক্তি

অবতীর্ণ হও, অদৃশ্যচারী মহাপুরুষদের অমোঘ সহায়তায় এবং পরমদেবতা'র অব্যর্থ আশীর্ব্বাদে সাধন-সমরে তোমরা বিজয়ী হইবেই হইবে। প্রথম প্রথম চেষ্টার অসাফল্য দেখিয়া ভয় পাইয়া যাইও না, নিরুৎসাহ হইও না, হতাশায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িও না। হাটিতে শিখিবার কালে শিশুরা দুই চারিটা আছাড় খাইয়াই থাকে, তাহাতে কি যায় আসে? পথ চলিতে চলিতে পায়ে অমন দুই দশটা কাঁটা ফুটিয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা কি? সাঁতার শিখিতে গিয়া দুই চারি ঢোক জল কে না

গিলিয়াছে ? গাছে উঠিতে গিয়া হাত-পা দুই একবার কে না ভাঙ্গিয়াছে ? পূজার ফুল তুলিতে গিয়া সলি দুই চারিটি। ফুল অসাবধানতায় সাজি হইতে পায়ে পড়িয়া যায়, তাতে পূজা বন্ধ থাকে না। ক্ষেত্রে ফসল বপন করিলে সবগুলি বীজই অঙ্কুরিত হয় না, তাই বলিয়াই দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া যায় না। সুতরাং অসাফল্য কে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবে না। একবার অকৃতকার্য্য হও ত' দশবার চেষ্টা করিবে, এক রকমে অপদস্থ হইয়াছ ত' শতগুণ তেজে শত প্রকারে আবার কার্য্যারম্ভ করিবে। মনে রাখিও, **উৎসাহই শক্তি, বিশ্বাসই সাফল্য ; আর অবসাদই অক্ষমতা, অনাস্থাই পরাজয়।** কি করিয়া মনকে বশীভূত করিতে হয়, কি করিয়া অবিবেকী মনকে বিবেকের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্মদর্শী পূর্ব্বপুরুষেরা বহু বহু যৌগিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপর একটী পরিচ্ছেদে * সেই বিষয়ে আংশিক ভাবে জানাইব। বর্ত্তমানে বীর্য্যক্ষয়ের অপরাপর কারণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই পরিচ্ছেদের * উপসংহার করিতেছি।

মনের চাঞ্চল্য নিবারণ কঠিন হইলেও বীর্য্যক্ষয়ের প্রক্রিয়াগত কারণগুলি অনায়াসেই দূর করিতে পার। ইচ্ছাপূর্ব্বক বীর্যক্ষয় কখনই করিও না। মনের দুর্ব্বলতাবশে দুর্ভাগ্য বশতঃ কখনও ইচ্ছা-পূর্ব্বক বীর্য্যক্ষয়ের কামনা জন্মিলে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া লোকসমাগমে উপস্থিত হইবে এবং সৎপ্রসঙ্গে, ভগবৎ-সঙ্গীতে বা আলস্যনাশক

---

* মূল রচনায় "পত্র" ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ে "পরিচ্ছেদ" করা হইয়াছে।

ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় নিবারণের উপায়

খেলা-ধূলা, ডন-কুস্তি বা যৌগিক আসন-মুদ্রাদিতে আত্ম-নিয়োগ করিবে। ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় নিবারণ শক্ত কথা নহে, অতি সামান্য কথা। তোমরা নিজেদের অপরিমেয় প্রচ্ছন্ন শক্তিতে এবং সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থা ন্যস্ত করিতে চাহনা বলিয়াই আজও দৈহিক কদভ্যাস-সমূহের দাস হইয়া রহিয়াছ। একবার বলি এই বিশ্বাসটী করিতে পার যে, তোমাদের অপেক্ষাও দুর্ব্বলচিত্ত হীন অধমেরা যখন উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে, জীবনকে বিশিষ্টতার পথে গতিদান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তুমিও নিশ্চয় তোমার জীবন-সূর্য্যকে কদভ্যাসের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিতে পারিবে। ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় যে আপাত-সুখকর পরিণাম-বিষ, ইহা বুঝিতে ত' তোমার আর বাকী নাই। প্রথম প্রথম বুঝিতে না পারিলেও আজ ত' সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ যে, **আত্ম-অপচয়জনিত সুখ অতি অল্পকালস্থায়ী এবং অকিঞ্চিৎকর, পরন্তু ইহার কুফল অতি ভয়ানক এবং চির-জীবনব্যাপী।** যে সুখে তোমার উৎসাহ-উদ্যম হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, যে সুখে তোমার দেহ-মনের দুর্ব্বলতাই বর্দ্ধিত হইতেছে, যে সুখে তোমার স্মৃতি-মেধা নাশ পাইতেছে, যে সুখ তোমার শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতা কমাইয়া দিতেছে এবং অন্তরে বাহিরে তীব্র যন্ত্রণার কারণস্বরূপ হইয়াছে, একটু আত্ম-বিশ্বাস থাকিলে, একটুখানি সঙ্কল্পের বল থাকিলে সে শর্করাচ্ছাদিত বিষ-বড়ির লোভ তুমি একদিনেই পরিত্যাগ করিতে পার। প্রতিদিন

ইচ্ছা করিলেই তুমি বীর্য্যক্ষয়কর কদভ্যাস ত্যাগ করিতে পার।

একই কার্য্য করিতে করিতে মানুষ অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে সত্য কিন্তু যাহা মন্দ, যাহা অকল্যাণদায়ক, যাহা চিরদুঃখেরই জনক, **এমন হলাহল তুমি চেষ্টার মত চেষ্টা করিলে একদিনেই ত্যাগ করিতে পারিবে, আজই পারিবে।** কাল ছাড়িব, পরশু ছাড়িব, তারপরের দিন ছাড়িব, এইরূপ অস্থির সঙ্কল্প রাখিও না। যতকিছু অকল্যাণকর অভ্যাস তোমাকে নাকালদড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে, তাহাদের মোহ আজ তুমি ছাড়, এই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ কর, দীর্ঘকালের সযত্নসেবিত অভ্যাসের মাথায় পদাঘাত হানিয়া, বহু কালের আচরণের মুখের উপর ঝাঁটার বাড়ি দিয়া তুমি আজ মুক্ত হও,

কুহকিনী মায়ায় ভুলিও না।

স্বতন্ত্র হও, আত্মপ্রতিষ্ঠ হও। তোমার অসংযম ও অসদাচারের যদি কেহ নাটের গুরু থাকিয়া থাকে, তোমার উন্নতি-মুখিনী চিত্তবৃত্তিকে টানিয়া নীচে নামাইবার জন্য চেষ্টিত যদি কোনও কুগ্রহ থাকে, নিয়ত কাম-সঙ্গ দিয়া, কাম-দৃশ্য দেখাইয়া, কাম-কথা শুনাইয়া, কামুকতার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে উদ্যত যদি কোনও দস্যু বন্ধুর ছদ্মবেশে থাকিয়া থাকে, তবে **এখনই তাহার মুখে পদাঘাত কর,** তাহার সহিত সকল সংস্রব বর্জ্জন কর, তাহাকে বাড়ীর ত্রিসীমানা হইতে **ঘাড়ে ধরিয়া তাড়াইয়া দাও।** তোমার প্রতি তাহার ভালবাসা জানাইয়া, তোমার প্রতি নানা ভাবে স্নেহ,

কুসঙ্গই ভুজঙ্গ ; কুসঙ্গ প্রাণপণে বর্জ্জন কর

আদর ও অনুরাগ দেখাইয়া, তোমার উন্নতিই যে তাহার নিত্য কালের প্রার্থনীয়, এমন কত মিনতি জ্ঞাপন করিয়া সে হয়ত তোমার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা-রক্ষণে ও প্রীতিবর্দ্ধনে যত্নবান্ থাকিবে, কিন্তু তাহার কুহকিনী মায়ায় ভুলিও না, তাহার কথায় কর্ণপাত মাত্র করিও না। হৃদয়কে দৃঢ় কর, পাষাণের মত কঠিন কর, পূর্ব্বানুরাগ বিস্মৃত হও এবং পাপের বন্ধুকে **কুলার বাতাস দিয়া চিরতরে বিদায় করিয়া দাও।** তারপরে বন্ধুর কুশিক্ষার কুফল হইতে দেহ-মনকে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। কুসঙ্গে পড়িয়া পরমশত্রুর প্ররোচনায় ভুলিয়া একদিন যাহা করিবার করিয়াছ, কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তেই অসদভ্যাসের দাসত্বকে বজ্রাঘাতে চূর্ণ কর।

কদভ্যাসের পরাধীনতা আর সহিও না

একটা কদভ্যাসের পরাধীনতা আর কতকাল ক্লীব কাপুরুষের মত নীরবে সহিবে? তোমাকে ভালমানুষ পাইয়া, নির্ব্বিবাদ, নির্ব্বিরোধ, সরল বালকটি পাইয়া কদভ্যাসরূপ এই পরমশত্রু তোমার স্কন্ধদেশে ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছে,—সুদৃঢ় সঙ্কল্পের ত্রিশূলাঘাতে ইহাকে নিপাতিত ও নিহত কর। ইহা তুমি অসাধ্য বিবেচনা করিও না, ইহা তুমি তোমার পক্ষে বিন্দুমাত্রও অসম্ভব মনে করিও না। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তাহা যে বুঝিতে পারে, সু এবং কু বিচার করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, কদভ্যাসকে সে কেন বর্জ্জন করিতে পারিবে না? আজ হইতে প্রতিজ্ঞা কর, যাহাকে অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছ, যাহাকে অশুভ বলিয়া

জানিয়াছ, তাহার সহিত আর কোনও আপোষ করা হইবে না, তাহার সহিত আর কোন প্রকার সংস্রব রাখা হইবে না, প্রাণান্তেও তাহার বশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। মানুষ কি না পারে? ইচ্ছা করিলে মানুষ হিমালয়ের শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে,

ইচ্ছা করিলেই কদভ্যাস ত্যাগ করিতে পার

মহারণ্য দগ্ধ করিয়া তাহাতে রাজপুরী নির্ম্মাণ করিতে পারে, অপার জলধি শুষ্ক করিয়া দিয়া তাহাকে বালু-তটে পরিণত করিতে পারে, মরুভূমিতে নন্দনোদ্যান সৃষ্টি করিতে পারে, আর তুমি সামান্য একটা কদভ্যাসকে ছাড়িতে পারিবে না? যে বিষয় প্রকাশ পাইলে লোকলজ্জার সীমা থাকে না, এমন একটা জঘন্য পাপকে তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না? মানুষের ভিতরে পরমেশ্বরের শক্তি সর্ব্বজীব অপেক্ষা অধিক প্রকটিত হইয়াছে। মানুষের অসাধ্য কি?

হয়ত ভাবিতে পার, অতি সাবধানে লুকায়িত থাকিয়া যখন করিতেছি, তখন কে আর জানিতে পারিবে? কিন্তু ইহা তোমার বুঝিবার ভুল। এই জগতে আর কেহ না থাকিলেও সকলের মাথার উপরে এমন একজন আছেন, যাঁহার দৃষ্টি

পাপ গোপন থাকে না

সর্ব্বত্র সমভাবে নিপতিত হইতেছে। তিনি সদসৎ প্রত্যেকটী চিন্তা, ভালমন্দ প্রত্যেকটী কার্য্য তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবে দেখিতে পাইতেছেন এবং পুণ্যবানের জন্য আত্মপ্রসাদ ও পুরস্কার এবং পাপাসক্তের জন্য অনুতাপ ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন। মনে

করিও না. আজিকার পাপের শাস্তি তোমাকে মরণের পরে কোনও এক অজ্ঞাত দেশে গিয়া পাইতে হইবে—অতএব পুণ্য করিয়া পাপের শাস্তি কমাইবার প্রচুর অবসর রহিয়া গিয়াছে। আজিকার পাপের শাস্তি তোমার আজ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—দেহের দৌর্ব্বল্যের মধ্য দিয়া. আহারের অরুচির মধ্য দিয়া, পাঠে মনোনিবেশের অসামর্থ্যের মধ্য দিয়া, কোনও নির্দ্দিষ্ট একটা সত্যের পায়ে আত্ম-সমর্পণের অক্ষমতার মধ্য দিয়া, নিজের বাহুবলে অনাস্থার মধ্য দিয়া। এই মুহূর্ত্ত হইতেই দণ্ডদাতা বিধাতা দণ্ড-বিধান আরম্ভ করিয়াছেন ; ইহা হইতে নিস্তার নাই, নিষ্কৃতি নাই। আরও এক কথা মনে রাখিও, **পাপে পুণ্যে কাটাকাটি যায় না।** যতটুকু পাপ, তার সবটুকু শাস্তি এবং যতটুকু পুণ্য, তার সবটুকু পুরস্কার তোমাকে নিঃশেষে ভোগ করিতে হইবে। তাই আবার বলি, এ মহাপাপ হইতে বিরত হও, অকাল-বীর্য্যক্ষয়রূপ পরম পাতকের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হও। আরও বুঝিয়া দেখ, তোমার পাপ ত' গোপন রাখিতে পারিতেছ না। এই জগতে কেহই কোন ব্যাপার গোপন রাখিতে পারে না। চোরের নৌকায় সাধুর নিশান উড়াইলেও একদিন না একদিন কাহারও না কাহারও কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে গিয়া স্বেচ্ছায় আত্মস্বীকৃতি করিতেই হইবে। গৃহকোণে যাহা সযত্নে লুক্কায়িত রহিয়াছে, দুর্ভাগ্যের বাতাসে তাহা সমগ্র জগতের নিকট ছড়াইয়া পড়িবেই। গোপনে পুণ্যানুষ্ঠান করিলেও যেমন তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া পড়ে, গোপনে পাপানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে তেমনই লোকের দৃষ্টি এক সময় না এক সময় না-পড়িয়াই পারে না। স্বয়ং পরমাত্মা নিজেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অনন্ত রূপে প্রকাশিত করিতেছেন, আর তুমি

তোমার জীবনকে, জীবনের গোপন কদাচারকে, জীবনের নিন্দিত পূতি-গন্ধকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে কি করিয়া? মুখে যদি নাও বল, তোমার চক্ষু তোমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তোমার গুপ্ত কথা সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে, কারণ, পাপীর চক্ষু সহজেই নত হইয়া পড়ে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও পেচক কখনও সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না। তাই বলি, আর নিজের প্রকৃত চরিত্রকে লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে ব্রহ্মচারী সাজিও না, নিয়ত বীর্য্যক্ষয়-পরায়ণ থাকিয়া সাধুত্বের ও নিষ্কলঙ্কত্বের মিথ্যা ভাণ করিও না, কাম-কুক্কুরের জঘন্য জীবন যাপন করিয়া মুখে প্রেম ও পবিত্রতার দোহাই দিয়া বেড়াইও না। মুখস যতই পর না কেন, ছদ্মবেশ যতই ধর না কেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সাধকের চক্ষুর সম্মুখে সে সকল টিকিবে না। তাই বলি, আত্মগঠনে এবং আত্মোন্নতি-সাধনে অকপট-চিত্তে ব্রতী হও, দৃঢ়চিত্ত হও, কঠোর-সঙ্কল্প হও, প্রাণান্ত-প্রযত্নপরায়ণ হও এবং অপূর্ব্ব পৌরুষ-প্রভাবে মানুষ-নামের গৌরব বর্দ্ধিত কর। সকল অবসাদ সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া, সকল অবিশ্বাস চরণে লাঞ্ছিত করিয়া, সকল কপটতা জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়া আজ তুমি যথার্থ ব্রহ্মচারী হও, নিজে ধন্য হও, কুলকে ধন্য কর এবং পরলোক-প্রস্থিত পূর্ব্বপুরুষ-গণের সাহ্লাদ প্রশংসা এবং সানন্দ আশীর্ব্বাদের যোগ্য পাত্র হও।

দৃঢ়চিত্ত হও

কিন্তু শুধু ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় বন্ধ করিলেই প্রক্রিয়াগত শুক্রক্ষরণের সকল কারণ বিদূরিত হইবে না। উপস্থ এবং তাহার সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য যন্ত্র যথা অণ্ডকোষ, যোনিলিঙ্গ এবং মেরুদণ্ডের

শেষপ্রান্ত প্রভৃতি স্থানগুলিকেও স্পর্শ করিবার কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইচ্ছামত বীর্য্যক্ষয় বন্ধ করার ফলে শরীরের কিরূপ উন্নতি হইল, বীর্য্যধাতু কিরূপ ঘনত্ব লাভ করিল, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনেক মন্দভাগ্য যুবক জননেন্দ্রিয়কে নাড়াচাড়া দিতে গিয়া পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বীর্য্যক্ষয় করিয়া বসে। কিন্তু হায়! ইহারা জানে না যে, স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতি

পাপ-কৌতূহল দমন রাখ

এইভাবে নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। বহুমূল্য যন্ত্রপাতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা না করিলে বহির্নির্গত বীর্য্যের উৎকর্ষাপকর্ষ শুধু চোখে দেখিয়া অনুমান করিবার শক্তি কাহারই নাই। শুক্রকোষ হইতে বহির্গত হইয়া মূত্রনালীর মুখে পড়া মাত্র শুক্রের সহিত কামগ্রন্থি-(Prostate Gland)-নিঃসৃত তরল রস মিশ্রিত হয়। কামগ্রন্থির দুর্ব্বলতা হেতু প্রয়োজনাতিরিক্ত অত্যধিক রস এবং তাহার ক্রিয়া-বৈকল্যহেতু প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম রস নিঃসৃত হইতে পারে। সুতরাং লিঙ্গ হইতে নির্গত বস্তু কতটা শুক্র আর কতটা কামগ্রন্থির রস, তাহা খোলা চক্ষে বিচার করিবার কাহার সাধ্য আছে? শুক্রমধ্যে শুক্রকীট আছে কিনা এবং তাহার মধ্যে জীবনী-শক্তি কতটা, প্রধানতঃ ইহারই উপরে শুক্রের শ্রেষ্ঠতা-নির্ণয় হইয়া থাকে। কৌতূহল যতই প্রবল হউক, তোমার কোন্ সাধ্য আছে ইহার বিচার করিবার? সুতরাং সাধু সাবধান!

প্রাণ গেলেও একান্ত ঠেকা ব্যতীত পুরুষেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে না। বলিতে কি, এই বিষয়ে এমন অভ্যাস করিবে, যেন নিদ্রা-

বস্থাতেও কখনও হাত পুরুষাঙ্গে না যায় বা জনন-যন্ত্রের সহিত কোনও ক্রমে শয্যার কোনও সংস্পর্শ না হয়। এই জন্যই একাকী এক শয্যায় শয়ন, উপুড় হইয়া না-ঘুমান, কোলবালিস ব্যবহার না করা ও কৌপীন ব্যবহার করা

একক শয়ন, পুরুষে-ন্দ্রিয়ের স্পর্শ

একান্ত আবশ্যক। নিদ্রাকালে নিদাঘ-রজনীতে একখানা পাতলা চাদর, এবং শীতের রাত্রে লেপ বা কম্বল মুড়িয়া শয়ন করিতে হাত দুইখানা চাদর, লেপ বা কম্বলের বাহিরে রাখিবার অভ্যাস করাও এই জন্যই কর্ত্তব্য। অজ্ঞাতসারে যাহাদের হাত জননেন্দ্রিয়ের দিকে চলিয়া যায় বলিয়া অতর্কিত কদভ্যাসে নিয়ত সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ত এই বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতাই দরকার। কোনও অবস্থাতেই যাহাতে জননেন্দ্রিয়ের দিকে হস্ত ধাবিত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শুধু সতর্ক-দৃষ্টি রাখাই যথেষ্ট নহে। অবিরাম মনে মনে নিজেকে অনুজ্ঞা (Auto Suggestion) করিতে হইবে,—"নিদ্রাবস্থায়ও এই হস্ত এই ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে না।" অবিরাম নিজ করদ্বয়ে মনঃসন্নিবেশন করিয়া অনুজ্ঞা করিতে হইবে,—"এই হস্ত জাগরণে বা সুষুপ্তিতে, স্বপ্নে বা ভ্রমে, কুবুদ্ধির পরিচালনায় বা কৌতূহলের প্ররোচনায় জননযন্ত্রকে স্পর্শ করিবে না, করিতে পারে না।" বারংবার দৃঢ়চিত্তে এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিতে করিতে অপকার্য্যে আসক্ত হস্তের স্বভাবটীকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হইবে। কেবল একটা আন্দাজী কথাই তোমাকে কহিলাম না। ইহা-সম্পূর্ণ সম্ভব ব্যাপার। ইহা অনেকের জীবনে সত্য হইয়াছে এবং তোমার জীবনেও ইহা সত্য

অনুজ্ঞার শক্তি

না হইবার কোনও কারণ নাই। দৃঢ় চিত্তে ও অগাধ বিশ্বাস লইয়া যাহারা অনুজ্ঞা করিবার অনুশীলন করিয়াছে, প্রত্যেকে তাহারা সফলকাম হইয়াছে। অনুজ্ঞার শক্তিতে কেবল তুমিই তোমার চরিত্র এবং প্রবণতা-সমূহের পরিবর্ত্তন করিয়া নিতে পার, তাহা নহে; অনুজ্ঞার শক্তিতে শক্তিমান ব্যক্তি বিশ হাজার মাইল দূরের নর-নারীর চরিত্র পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া নিতে সমর্থ। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার হাতেই রহিয়াছে। অনুজ্ঞার বলে যে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে, বিশ্বের সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রক্ষার সামর্থ্য তাহার আস্তে আস্তে আসে।

জননাঙ্গ-স্পর্শনে, অণ্ডকোষ-ঘর্ষণে এবং যোনিলিঙ্গ ও মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে আঘাত-দানে অথবা গুপ্তস্থানের রোমাবলী-স্পর্শনে, * স্বভাবতঃই কামপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে এবং অজ্ঞানান্ধ মোহাবিষ্ট সাধন-সামর্থ্যহীন মানবকে কুকর্ম্মে রত করিয়া তাহার ইহকালের ও পরকালের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনাজনক ও কামসুখ-লালসার প্ররোচনাবর্দ্ধক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে খড়্গ-হস্ত হইতে হইবে। তোমাদিগকে

গুপ্তস্থানের রোমাবলী কর্ত্তন

আত্ম আত্মগঠন করিতে হইবে,—তাই মনে রাখিও, তোমাদের আজ অতি তীব্র, অতি সতর্ক, সদা-জাগ্রত প্রহরা

---

* গুপ্তস্থানের রোমাবলী স্পর্শনে অনেক ক্ষেত্রেই কামপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে দেখা যায় বলিয়াই "রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বথা

চাই। কোনও ক্রমেই যাহাতে বীর্য্যক্ষয় না ঘটিতে পারে, কোনও প্রকারেই যাহাতে বীর্য্যক্ষয়ের কারণসমূহ না হইতে পারে, তাহার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া আদা-নুন খাইয়া "মরিয়া" হইয়া লাগিতে হইবে। ছিদ্রকরা কলসীকে কি কখনও জলপূর্ণ রাখা যায়? যে দেহ হইতে নিয়তই শুক্রের ক্ষয় হইতেছে, শুধু আহার্য্য বস্তুর পোষণী শক্তিদ্বারা কি সেই দেহের স্বাস্থ্য, শক্তি ও পুষ্টি সংরক্ষিত হইতে পারে? দেহের অপচয়কে যেমন করিয়াই হউক, বন্ধ করিতেই হইবে; যত কৃচ্ছ্র-স্বীকার করিয়াই হউক, বীর্য্যধারণ করিতেই হইবে; জীবনের পরম-শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভের জন্য যত কষ্টসাধ্য নিয়মই হউক না কেন, পালন করিতেই হইবে। অনুযোগ অসুবিধার দোহাই টিকিবে না, অনবসরের ওজুহাতে কুলাইবে না।

আদা-নুন খাইয়া লাগ

পরিবর্জ্জয়েৎ" উপদেশ রহিয়াছে। কিন্তু গুপ্তস্থানের রোমাবলী স্পর্শ হইতে বিরত রহিলেই চলিবে না, স্পর্শ করিবার কোনও বিশেষ প্রয়োজনও যাতে না পড়ে, তদ্রূপ ব্যবস্থাও দরকার। সাধারণতঃ গুপ্তস্থানের রোমাবলীকে অত্যন্ত বড় হইতে দিলে আবর্জ্জনা জন্মিয়া দক্রু এবং উৎকুনাদি কীটও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে, বাধ্য হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে বারংবার হস্ত-চালনা দ্বারা মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। এজন্য আমরা প্রতি মাসে অন্ততঃ দুইবার করিয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে কাঁচি দিয়া উক্ত রোমাবলী কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে উপদেশ দেই। ক্ষুরের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং আপত্তিজনক।

সকামভাবে স্ত্রীলোক বা তাহার আলেখ্য দর্শনে, স্ত্রীলোকের সহিত বৃথা আলাপনে, স্পর্শনে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা রক্ষণে ও স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে কদালোচনার ফলে, স্ত্রীলোক ও কামুক পুরুষের ব্যবহৃত শয্যা-বস্ত্র-মাল্যাদি ব্যবহারে, নারী বা পুরুষের গুপ্তস্থান নিরীক্ষণে, যার তার সংসর্গে অবস্থানে, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা-সম্পাদক মশলাদি-সংযুক্ত আহারীয় গ্রহণে, কামুক ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট সেবনে, সর্ব্বদা প্রয়োজনাতিরিক্ত ও আঁটা-সোটা পোষাক-পরিচ্ছেদ ব্যবহারে এবং এইরূপ আরও নানা কারণে কামরিপু প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সকল তোমাদের অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন কর

ভালবাসা বা প্রীতি-প্রণয় দেখাইবার জন্য বন্ধু-বান্ধব বা বালক-বালিকার সহিত গলাগলি বা জড়াজড়ি করিয়া থাকা, আদর জানাইবার জন্য চুমা খাওয়া বা আলিঙ্গন করা প্রভৃতিও অনেকস্থলে কামোদ্দীপক।

গলাগলি, জড়াজড়ি, চুম্বন ও আলিঙ্গন

স্ত্রীজাতির রূপলাবণ্য বা লালসাসঙ্কুল হাবভাবের বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ, এই সকল বিষয়ের আলোচনা, ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার ভাণ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ও বাইবেলের অশ্লীল অংশসমূহ পাঠ বা রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের গভীর মর্ম্ম অবধারণে অসামর্থ্যসত্ত্বেও শৃঙ্গার-রস-মূলক বৈষ্ণব কবিতাবলীর আলোচনা,—এই সমস্তই কামোদ্দীপক।

স্ত্রীলোকের বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থপাঠ

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নারীজাতির প্রতি

মাতৃবুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ ঘটিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেহের দ্বারা, মনের দ্বারা, স্মৃতির দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা যে ভাবেই যতটুকু নারী-সংশ্রব স্পৃষ্ট হউক না কেন, তাহাই অমঙ্গলজনক। বস্তুতঃ নিয়ত নারী-সঙ্গে থাকিয়া বা নারীর চিন্তা করিয়া কাম-চঞ্চল হয় না, এমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ চির-কালই দুর্ল্লভ। কলিযুগেই নহে, বহুপ্রশংসা-সম্বর্দ্ধিত সত্য-ত্রেতাদি যুগেও এইরূপ আত্মজয়ী পুরুষের অভাব যথেষ্টই অনুভূত হইত। বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, পরাশর প্রভৃতি ত্রিকালপূজিত ঋষিগণও রমণীর রূপের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া পদস্খলিত হইয়াছিলেন। এমন যে তপস্যাঘাতিনী নারী, কামপ্রভাবে যাহার অন্ধ চক্ষুও কুরঙ্গ-নয়ন বলিয়া মনে হয়, যাহার রোগাক্রান্ত ঘৃণিত গাত্রচর্ম্মও লাবণ্যমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়, যাহার জঘন্য হলাহলবর্ষী সংসর্গ পরম সুখ-সেব্য বলিয়া ধারণা জন্মে,—ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে যাইও না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনে-প্রাণে তাহাকে জননী বলিয়া ভাবিতে না পারিতেছ। যুগে যুগে নানাদেশে নারী কি না করিয়াছে? মুনিজনের সে তপোভঙ্গ করিয়াছে, ঋষির সে ঋষিত্ব নাশ করিয়াছে, রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটকে সে পথের ভিখারী করিয়াছে, মহাপুণ্যবানকে সে নরকে ডুবাইয়াছে। জ্ঞানীকে সে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে, গুণীকে সে অপদার্থে পরিণত করিয়াছে, হৃদয়বান্ পরদুঃখকাতর মমতা-বিগলিত মহৎকে সে নিষ্ঠুর নির্ম্মম মনুষ্যত্বলেশহীন দানব করিয়া ছাড়িয়াছে। এমন যে মহা-অনর্থ-সম্পাদিকা নারী—

নারী-সংশ্রব কতকাল বর্জ্জনীয়

নারী-সংস্পর্শে পুরুষের পতন

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে অকপটচিত্তে মাতৃরূপে পূজা করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে কালভুজঙ্গী বোধে সুদূরে রাখিয়া চলিও, তাহার ছায়াস্পর্শ করিও না।

কিন্তু নারী হইতে দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে না, মনে মনেও তাহাদের কাছ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥"

(গীতা—৩-৬)

"যে ব্যক্তি (বাহিরের) কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে (যথা,—বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ) সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ স্মরণ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তিকে কপটাচারী বলে।"

কিন্তু মানসিক দূরত্ব রক্ষার অনুরোধে স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিতে শিখিলেও তোমরা লাভবান্ হইবে না। এই জাতি তোমাকে এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগকে দশমাস দশদিন কত কষ্ট স্বীকার করিয়া গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, নিজেদের শরীরের রক্তকে দুগ্ধে পরিণত করিয়া তাহা পান করাইয়া তোমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন,—ইঁহাদিগকে ঘৃণা করিবার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু, জীবন-গঠনের জন্য, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ মঙ্গলকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, মানুষের বংশে জন্মিয়া মনুষ্যত্বের উন্মেষ-প্রয়াসে সফল-প্রযত্ন হইবার জন্য, যতকাল আবশ্যক

নারীজাতিকে ঘৃণা করা প্রয়োজন নহে

পড়িবে, ততকাল তোমাকে স্ত্রী-বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। স্ত্রী-বর্জ্জন মানে, যাহাকে মা বলিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করে না, তাহাকে দেহে, মনে ও বাক্যে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্‌রূপে বর্জ্জন।

নারীমাত্রেই জগন্মাতার অংশসম্ভূতা

নারীমাত্রকেই জগন্মাতার অংশসম্ভূতা মহাশক্তিরূপিণী জননী জানিয়া মনে মনে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লুটাইয়া প্রণাম করিবে, আর প্রার্থনা করিবে,—'মা আমায় দয়া কর, ওগো বিশ্বময়ীর অংশ-স্বরূপিণী জননি, আমার হৃদয়ে ভক্তি দে, প্রেম দে, মানুষ হইবার শক্তি দে, সংযম-সামর্থ্য দে।" সম্বন্ধ-বিচার নাই,—তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীকেও তুমি মনে মনে মা বলিয়া ভাবিতে পার, ভ্রাতুষ্পুত্রী বা ভাগিনেয়ীরও চরণে মনে মনে পূজার অঞ্জলি দিতে পার। জাতি, কুল বা অবস্থার বিচার নাই,—চণ্ডাল, মেথর বা মুচির কন্যাকেও তুমি মা বলিয়া জানিও, ভদ্রপরিবারের সতীত্ব-সীমন্তিনী কুললক্ষ্মীগণের সাথে চলমান-পণ্য-বীথিকা-স্বরূপিণী মন্দভাগিনী বার-বনিতাকেও মা বলিয়া ভাবিও। মানুষ তাহার শ্রদ্ধাভক্তির বলে এক টুক্‌রা প্রাণহীন প্রস্তর বা মৃত্তিকায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জীবনের চরম সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। জীবন্ত মানুষের মধ্যে, হউক না সেই মানুষ মেছুনী বা মেথরাণী, হউক না সেই মানুষ কুলটা বা গণিকা, তাহারই মধ্যে মাতৃবুদ্ধির আরোপ করিয়া মানুষ তাহা অপেক্ষা অল্প সৌভাগ্য অর্জ্জন করিবে না। নারীর ভিতরের মহাকল্যাণী মূর্ত্তি যদি জাগিয়া ওঠে, তাহা হইলে সে না করিতে পারে, এমন কোনও কুশল নাই। সে কিছুই জানিল না, দূরে থাকিয়া সে

রক্তমাংসের ডেলাই রহিয়া গেল কিন্তু তোমার অন্তরের শ্রদ্ধার বলে পরমকল্যাণ তুমি তাহার কাছ হইতে আহরণ করিয়া নিলে। সত্যই ইহা এক পরম কৌতুকাবহ বিচিত্র ব্যাপার, কিন্তু ইহা অভ্রান্ত এবং যথার্থ।

মা বলিয়া জানিলে স্ত্রী-রূপ-চিন্তনে স্ত্রীসঙ্গ হয় না, মাতৃ-সঙ্গই হয় । কিন্তু মনের সহস্র পবিত্রতা সত্ত্বেও

স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন

স্ত্রীলোকের সহিত প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিবে না।

অকারণ ঘনিষ্ঠতা করিয়া বর্দ্ধন
মনেরে পঙ্কিল করে যত মূর্খ জন।

ওঠে, বসে, কথা কয়, হাসে, নাচে, গায়,
তার সাথে অলক্ষিতে ডোবে লালসায়।

ধরিয়া স্নেহের রূপ, করুণার ছবি,
ধীরে ধীরে সৃষ্ট হয় বিষাক্ত অটবি ।

হিংস্র শ্বাপদেরা আর ভুজঙ্গ কুটিল
বিনয়ী মনেরে করে জঘন্য দুঃশীল।

জানিও এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জীবনে যাহারা আচম্বিতে আঘাত পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছে, এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবনের পরমদুর্য্যোগময়ী অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি এই সকল বাণী। তাই, মনে মনে জানিবে নারীকে মাতা, তোমার সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী,

কিন্তু মনের এই পবিত্র ভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াই চলিও। মাতৃ-সম্বোধনকে বহুরূপী সাজাইয়া নিজেও ঠকিও না, অপরের সহিতও প্রবঞ্চনা করিও না।

নিয়ত কল্যাণবন্ত থাকিবার জন্য বারনারীকেও মা বলিয়াই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে হইবে বটে, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে মৌখিক মাতৃসম্বোধন করিয়া কোনও নারীর সহিত অযথা ও বৃথা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির চেষ্টা অপরাধজনক।

স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ

এই প্রসঙ্গে ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেদিন মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, সেইদিন তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"প্রভো, স্ত্রীজাতির প্রতি কীদৃশ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?" বুদ্ধদেব বলিলেন,—"**অদর্শন**" অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।" আনন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"হে ভগবান্ ! যদি সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য ?" শ্রীবুদ্ধ বলিলেন,—"হে আনন্দ ! **অনালাপ**।" অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিবে না। আনন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"হে গুরো ! যদি তাঁহারা আলাপ করেন, তবে কি করিব ?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "হে আনন্দ, **উপস্থাপন**।" অর্থাৎ তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও উপাসনা করিবে। ভগবান্ বুদ্ধের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ হইতে ব্যাখ্যা-স্বরূপে আমরা এই কয়টী মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারি যে, প্রথমতঃ যেখানে স্ত্রীলোক দর্শন না করিলে চলে, সেখানে

ইচ্ছাপূর্ব্বক দর্শন অপরাধ-জনক, দ্বিতীয়তঃ যেখানে বাক্যালাপ না করিলে চলে, সেখানে নিজ হইতে সাধিয়া কথাবার্ত্তা বলা অপরাধ-জনক ; তৃতীয়তঃ যেখানে বাক্যালাপ প্রয়োজন, সেখানে পূজাভাবের অর্থাৎ মাতৃভাবের অভাব অপরাধজনক ।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের 'অদর্শন' কথাটির মধ্যে আরও একটী গূঢ় অভিপ্রায় রহিয়াছে। যাহাকে কখনও দেখি নাই, তাহার সম্বন্ধে কোনও কুৎসিত বা কদর্য্য চিন্তা আমার মনে জাগিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ

ঈশ্বর-পুত্র যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—"যখনই কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার সহিত ব্যভিচারই করে।" যাহার প্রতি দৃষ্টিই কখনো পড়ে নাই, তাহার প্রতি কামভাব আসিবার অবসরই হয় না।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের উপদেশও এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিতেছেন,—

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দরশন দূরে থাক, প্রকৃতির নাম যদি শুনি।।
তবে হি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অর্থাৎ—"আমি ত' সন্ন্যাসী (সর্ব্বপ্রকার কামচাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়-লালসার অনেক ঊর্দ্ধে), তবু আমি প্রকৃতির (স্ত্রীলোকের) দর্শন ত:

দূরের কথা, নাম শুনিলেও বিরক্ত হই। আমার তনুমনই যখন প্রকৃতি-দর্শনে বিকারগ্রস্ত হয়, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতি-দর্শনে মন স্থির রাখিতে পারে ?”

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য জগতের জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের মধ্যে একজন পরমশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি যে নিজের জিতেন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এমন শিথিল অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহা শুধু জীবশিক্ষাতরে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য। জীবশিক্ষার জন্যই তিনি পরম-জিতেন্দ্রিয় ছোট-হরিদাসকে নামমাত্র অপরাধে চিরতরে বর্জ্জন করিলেন, আর ছোট-হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন দিলেন।

শ্রীচৈতন্যের উপদেশ

“প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥”

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অর্থাৎ—“বিষয়-বিরাগী হইয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলে, তাহার মুখদর্শনও আমি করিতে পারি না। দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি ভোগ্য বস্তুকে) গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। রক্তমাংসে গঠিত সজীব নারীর কথা দূরেই থাকুক, এমন কি কাষ্ঠনির্ম্মিত নির্জ্জীব স্ত্রীমূর্ত্তিতে পর্য্যন্ত সাধারণ

লোকের কথা আর কি বলিব, তপঃ-স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ মুনিদিগেরও মনে চাঞ্চল্য আনিতে পারে।"

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং ?—হি নারী।"

(মণিরত্নমালা)

অর্থাৎ—"জীবগণের বন্ধন কি ?—না নারীই বন্ধন।"

মহাত্মা তুলসীদাস বলিতেছেন—

"দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী।"

মহাপুরুষদের কি নারী-জাতির প্রতি বিদ্বেষ ছিল ?

স্ত্রীজাতির প্রতি বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষদের কোনও বিদ্বেষ ছিল, এমন মনে করিতে পারি না। কারণ, প্রকৃত মহাপুরুষেরা সর্ব্ববিধ হিংসা ও বিদ্বেষের অতীত। আর ইঁহারা কি মাতৃগর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন নাই, মাতৃস্তন্যেই জীবনধারণ করেন নাই, মাতৃ-অঙ্কেই লালিত-পালিত হন নাই?—না, মাটী ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন, কিম্বা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন ? তথাপি যে ইঁহারা নানা ভাবে স্ত্রী-সম্পর্ক পরিত্যাগে উপদেশ দিতেছেন, তাহার কারণ এই যে, নারী-সম্পর্কে প্রবর্ত্তক সাধকের সহজেই চিত্তবিকার জন্মে, যোগভ্রষ্টতা ঘটে। জীবের দুঃখে যাঁহারা কাঁদিয়া মরিলেন, দুঃখনিবারণপথের বিঘ্নগুলি তাঁহারা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইয়া কেমনে থাকিতে পারেন ? **অগঠিত অবস্থায় নারী পুরুষের বিঘ্ন, পুরুষ নারীর বিঘ্ন।** এই সময়ে পরস্পরের মধ্যে

সম্বন্ধটা কতকটা রসনা ও তেঁতুল এবং অগ্নি ও ঘৃতের মতন, একে অপরকে প্রলুব্ধ করে, একে অপরের বাসনার শিখাকে লেলিহমান করে, একে অপরকে দুরন্ত মনশ্চাঞ্চল্যে অধীর করে। সুতরাং কল্যাণ-প্রার্থীদিগকে পরদুঃখকাতর মহাপুরুষেরা সাধনার প্রথম অবস্থায় সর্ব্ববিধ বিঘ্নের তুচ্ছ সম্ভাবনাটুকু হইতেও দূরে থাকিবার জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ অত্যধিক উৎসাহ-প্রযুক্ত একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়াই যেন মাতা, ভগিনী বা কন্যাসহ নির্জ্জনে অবস্থান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ—

"বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষয়েৎ।"

অর্থাৎ—"ইন্দ্রিয়-সমূহ এমন বলবান্ যে, জ্ঞানীদিগকেও পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।"

তবে বলা বাহুল্য, নারীজাতির প্রতি বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি সিদ্ধ-মানবগণের বিন্দুমাত্রও ঘৃণা বা বিদ্বেষ না থাকিলেও তাঁহারা যেই যেই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সেই যুগে সামাজিক ভাবে নারী-জাতি পুরুষজাতির নিকটে অশেষ শ্রদ্ধাভাজিনী ছিলেন না। ইহা নারীদের দোষ নহে, পুরুষদেরই স্বার্থপরতা ও একদেশদর্শিতার ফল। আমরা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, যে সময় হইতে অপরাপর বহু নিগৃহীত সম্প্রদায়ের ন্যায় নারী-সম্প্রদায়েরও ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। তাই, বিবিধ যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশসমূহ দিনের পর দিন ক্রমশঃ উদারতর ও গভীরতর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-পালনার্থীর জীবনে অনুসৃত হইবে। অতীতের ভারতবর্ষ তাহার পুণ্য-প্রতিভায় বর্ত্তমানের অন্ধতমসাচ্ছন্ন বিভীষিকা-সঙ্কুল ভারতবর্ষকে শুক্রহত্যার নিঠুর কবল হইতে রক্ষা

করিয়াছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ অতীতের ভারতবর্ষ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর অস্তিত্বের দাবীতে আজ অতি দ্রুত আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইতেছে। এমন দিন ভারতবর্ষের অতি দ্রুতই আসিতেছে, যেদিন নারীজাতির পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে, অবরোধের অন্ধ কারাকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া নারীরা জীবনের অধিকাংশ কর্ম্মক্ষেত্রে বৈদিক যুগের ন্যায় পুরুষজাতির পূর্ণ সাহচর্য্য করিবে, অনাথ-আতুরের সেবিকারূপে, দীন-দুঃখীর সান্ত্বনা-দাত্রীরূপে, প্রয়োজনবশে স্থলবিশেষে রণরঙ্গিণীরূপে পুরুষের সঙ্গে সমান পায়ে সমান তালে জীবনের পথ চলিবে। সেদিন নারীকে অশ্রদ্ধা করিয়া উপেক্ষা করিয়া বা ঘৃণা করিয়াই অসংযম হইতে প্রাণ বাঁচান যাইবে না—তাহার জন্য উৎকৃষ্টতর উপায় চাই। "নারী-দর্শন করিব না",—এইরূপ প্রতিজ্ঞা সেদিন বিফল হইবে, "স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করিব না",—এইরূপ সঙ্কল্প সেদিন ব্যর্থতা আহরণ করিবে; পরন্তু পূজাভাব, শ্রদ্ধা বা মাতৃবুদ্ধিই সেদিন পুরুষ জাতির আত্মরক্ষার অক্ষয়-কবচ হইবে।

সমাগত যুগ ও স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্ত্তন

"স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিও না; রমণী মাত্রেই সাক্ষাৎ কাল-ভুজঙ্গী; জননী, ভগিনী বা কন্যাকেও ভয় করিয়া চলিও",—এই সকল উপদেশ আর সেদিন জননীর জাতির মাতৃত্বের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার গৌরবকে অবমাননা এবং পুরুষজাতির আত্মনিষ্ঠা ও চিত্তসংযমের ক্ষমতাকে অস্বীকার করিতে পারিবে না। **মনুষ্যত্বের বাজারে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ভয়-বিজৃম্ভিত সংযমোপদেশ আর বিকাইবে না।** সেদিন স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবই নারীর প্রলোভন-জনয়িত্রী মায়ার কুহক দূরীভূত

করিবে এবং পুরুষের নিত্য-ভোগ-লোলুপতাকে বজ্রের ন্যায় শতধা চূর্ণীকৃত করিবে। **মহামন্ত্র "মা"** তখন কামান্ধ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-গগনে বজ্র-বিদ্যুতের কঠোর উজ্জ্বলতা এবং স্নিগ্ধ বরষার সজল সরসতা সমাহৃত করিবে।

কখনও যদি স্ত্রীগণ-মধ্যে অবস্থান করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মানসিক বৃত্তিগুলিকে স্থির, অচঞ্চল, আত্মস্থ ও অনাবিল রাখিয়া, নিজ চরিত্রবলে গভীর বিশ্বাস রাখিয়া, ভগবান্‌কে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া এবং স্ত্রীজাতিতে সর্ব্বতোমুখিনী মাতৃবুদ্ধি রাখিয়া অবস্থান করিও। সাংসারিক প্রয়োজনে বা স্বদেশ-স্বজাতির কল্যাণকল্পে যদিও কখনও মহিলাদের সহিত মিলিবার মিশিবার আবশ্যকতা জন্মে, তাহা হইলে কখনও ভীত, ত্রস্ত ও শঙ্কিত মন লইয়া ইহাদের মধ্যে যাইও না। ইহারা যে তোমার জননী এবং জননীর প্রতি যে তোমার সন্তানোচিত ভাব ব্যতীত **স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব** অপর কোন ভাবই উপজাত হইতে পারে না, এইরূপ সুদৃঢ় প্রত্যয় লইয়া ইহাদের সম্মুখীন হইবে। এইরূপ বজ্র-কঠিন অনমনীয় আত্মপ্রত্যয় এবং সর্ব্বভেদী সুতীক্ষ্ণ ভগবন্নির্ভর লইয়া চলিলে কোন অকল্যাণই তোমাকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারিবে না। পরন্তু নিয়ত-সংশয়-চঞ্চল অনাস্থা-পীড়িত অবিশ্বাসাতুর মন লইয়া যাহারা পথ চলে, তাহারা স্ত্রীগণ হইতে সর্ব্বসময়ে দূরে থাকিয়াও অসংযম হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। বনের বাঘে আর কয়টা মানুষ খায়? মনের বাঘেই অধিকাংশ মানুষের ঘাড় ভাঙ্গে। এই বুঝি সংযমের বাঁধন খুলিয়া গেল, এই বুঝি আত্মসংযম হারাইলাম, কোনও

স্ত্রীলোকের মুখ দৈবক্রমে একবার চোখে পড়িয়া গেলেই বুঝি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, প্রয়োজন-বশে স্ত্রীলোকের সহিত একটা কথা কহিলেই বুঝি নরকে ডুবিয়া মরিলাম,—এইরূপ বৃথা দুশ্চিন্তা যাহারা করে, তাহারাই মরে ; স্ত্রীলোক হইতে শত যোজন অন্তরে থাকিয়াও তাহারা কিছুতেই বীর্য্যধারণ করিতে পারে না। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে যাহারা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন প্রকারের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিতে যায় না, পরন্তু কাজ ঠেকিলে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। যুবকদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, যাহারা স্ত্রীলোকের সহিত একবার কুটুম্বিতা করিবার সুযোগ পাইলে সেই সুযোগকে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়া ফেলে। লেবু কচলাইতে কচলাইতে তাহারা তাহাকে তিক্ত করিয়া ছাড়ে। একদা হয়ত কোনও মহিলাকে ভিড়ের মধ্যে লোকের চাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, বেশ করিয়াছ, কিন্তু সেই এক সূত্র ধরিয়া ঘনিষ্ঠতা পাকাইবার নিত্য নূতন তোড়জোড় চালাইবার তোমার কোনও অধিকার নাই। একদা একটী মহিলার সহিত এক ট্রেণে বা এক বাসে দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল এবং সেই সময়ে তোমাদের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া রুগ্নের পথ্য কৈ-মাগুরের মতন নিত্য জল-বদল করিয়া সেই পরিচয়কে জীয়াইয়া রাখার কোনও আবশ্যকতা নাই। যাহারা এই সকল অনাবশ্যক জঞ্জাল-সৃষ্টি হইতে নিজেদের দূরে রাখে, তাহাদের জীবন-সংগ্রাম বহুল পরিমাণ জটিলতা হইতে প্রমুক্ত হইয়া থাকে।

মাতৃসম্বোধন না করিয়া এবং চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাইয়া নারীর

সহিত বাক্যালাপ আর্য্য-শিষ্টাচারের বিগর্হিত আচরণ। **কথাই যদি বলিবার প্রয়োজন পড়ে, 'মা' কথাটী স্পষ্ট করিয়া এবং ভক্তিভাবে বলিতে ভুলিও না।** তাঁহার পদদ্বয় মনে মনে প্রণাম করিতে করিতে প্রয়োজনীয় বাক্যবিনিময় করিও। মাতৃভাবের ভিতরে বিন্দুমাত্র কপটতা বা ভেজালকে তিষ্ঠিতে দিও না। সুপ্রসন্ন ও অকৃত্রিম মাতৃভাবের ভিতরে বাচালতা বা আতিশয্যের জন্য কোনও স্থান বা প্রশ্রয় রাখিও না। তোমার বাক্যের ভাষা শিষ্ট, সঙ্গত এবং সুপবিত্র হওয়া চাই। বৌদিদি বা দাদার শ্যালী প্রভৃতি সম্বন্ধের সুযোগ লইয়া কখনও পরিহাস বা বিদ্রূপের ভাবেও শ্লীলতার সীমা অনুমাত্র লঙ্ঘন করিও না।

স্ত্রীজাতির সহিত বাক্যালাপ

মরা গরু দেখিলে যেমন শকুনির পাল আসিয়া পড়ে, ঠিক তেমনি বাক্যের অসংযম দেখিলেও যত কুবুদ্ধি যত কুমতি আসিয়া তোমার ইচ্ছা ও চেষ্টার অগোচরে তোমার ঘাড় চাপিয়া ধরিবে। সামান্য রসিকতার সূত্র পাইয়া কামুকতা কি ভাবে যে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব চরিত্র-সম্পদকে আক্রমণ, পরাহত ও গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তাহা টেরও পাইয়া উঠিবে না।

তরল পরিহাস ও কামরিপু

কামরিপু বন্য হস্তী বা সিন্ধুঘোটক নহে যে, মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় তুমি তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে! কামরিপু সূচির অপেক্ষাও সূক্ষ্মগতিতে চিত্তমধ্যে প্রবেশপথ সৃষ্টি করিয়া লয়, আর প্রকাশিত হইবার সময় নানা বাসনার প্রতপ্ত শিখায় হৃদয়মন দগ্ধ করিতে করিতে বিশ্ববিদাহী

দাবানলের আকৃতি পরিগ্রহ করে। এই দাবানলে পড়িয়া কত সোণার সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, কত প্রদীপ্ত ভাস্কর প্রভাতের রশ্মি বিতরণ করিতে না করিতেই কলুষ-সমুদ্রে চিরতরে ডুবিয়া মরিয়াছে, কত পূর্ণিমার চন্দ্রমা প্রথম জ্যোৎস্নার সুমধুর স্নিগ্ধ হাসিটি হাসিতে না হাসিতে রাহু-গ্রাসে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? শুধু বাচালতা, শুধু রসিকতার প্রলোভন, শুধু বাহাদুরী লইবার লোভ যে কত জনের কপাল খাইয়াছে, কত জনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাজা রক্ত পান করিয়াছে, কে তাহার সীমা-সংখ্যা করিবে?

কামুক স্ত্রীপুরুষের ব্যবহৃত বস্ত্র-মাল্যাদি ধারণ এইজন্য নিষিদ্ধ যে, বস্তুর সহিত অধিকারীর স্মৃতি বর্ত্তমান থাকেই। ইহাতে কামাতুর ব্যক্তির ধ্যান করা হয়। ফলে তাহার কাম-ভাব নিজের মধ্যে সংক্রামিত হয়, আরও একটী সূক্ষ্ম কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সংস্পর্শ দ্বারা তোমার স্পৃষ্ট ও ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ প্রবাহিত হয়।

কামুক স্ত্রীপুরুষের বস্ত্রমাল্যাদি ব্যবহার

সাধু-পুরুষের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি না জানিয়াও যদি স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলেও স্বতঃই সাধুভাবের উন্মেষ হয়। যেখানে বসিয়া কোনও সৎপুরুষ পরম-কল্যাণ চিন্তাসমূহ নিবিষ্ট চিত্তে করিয়াছেন, না জানিয়াও যদি তুমি কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থান কর, তোমার হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হইয়া যাইবে। সাধুপুরুষদের জীবনব্যাপী তপস্যার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ হইতে এই ভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও পীঠস্থানসমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে যে তীর্থ-মাহাত্ম্য কমিতেছে, তাহাও তীর্থস্থানে

অনাচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারেরই ফল-স্বরূপ। কামুক ব্যক্তি যে স্থানে অবস্থান করে, তেমন স্থানে গমনে বা অবস্থানে এবং যে দ্রব্যটি ব্যবহার করে, তাহা ব্যবহারে অনেক স্থলে মনের মধ্যে কামভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

আরও একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা থাকা প্রয়োজন। মানুষ মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে, সহপাঠী সহপাঠীর প্রতি, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর প্রতি অনুরক্ত হয়, ইহা স্বভাবের ধর্ম্ম। এই স্বাভাবিক ভালবাসায় আবিলতা বা অপরাধ খুব অল্পস্থলেই থাকে। কিন্তু এই অনুরাগের অনুরোধকে বাড়াবাড়িতে নিয়া "হা-হতোস্মি"-র ভাবে পরিণত করিলে বা **দৈহিক মাখামাখি আরম্ভ করিলে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল নৈতিক দুর্গতি ও মানসিক অবনতি।**

দৈহিক মাখামাখির কুফল

এই দৈহিক মাখামাখিটা সব সময়েই যে চেষ্টা দ্বারা সৃষ্ট হয়, তাহা নহে। পরন্তু পরস্পরের স্বাভাবিক অনুরাগের **আতিশয্য হইতে** আপনি ইহা অজ্ঞাতসারেই আসিয়া পড়ে। ক্লাসে প্রতিদিন একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসিবার রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে ইহা গলাগলি ধরিয়া রাস্তায় বেড়ান, একের জামা-কাপড় অন্যে ব্যবহার, একপাত্রে আহার ও এক শয্যায় শয়নে গিয়া পৌঁছে। বাহির হইতে সকলে দেখিতে পায়—কি অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, আর সেই সময়েই বন্ধুত্বের যথার্থ পবিত্রতাটুকুতে গোপনে গোপনে ঘুণে ধরিতে আরম্ভ করে এবং দুইদিন পূর্ব্বে যাহারা ভাবে ও ব্যবহারে পরস্পরের প্রতি ছিল দেবশিশুর ন্যায় নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক, তাহারাই পরস্পরের প্রতি হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন

হিতাহিত-বোধবর্জ্জিত বন্য বর্ব্বর। বন্ধুত্ব তখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিষ্ঠাহীনতা জন্মায়, সুনীতি ও সুরুচিকে পূতিগন্ধময় নর্দ্দমার জলে নিক্ষেপ করে, ধর্ম্মবোধকে পদবিদলিত করে এবং সংযম-বুদ্ধিকে নখের টোকায় উড়াইয়া দেয়। নির্দ্দোষ ভালবাসা-হেতু একদিন যাহার সান্নিধ্য চিত্তপ্রসাদ জন্মাইত, প্রাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইন্ধন যোগাইত, ত্যাগ-ব্রহ্মচর্য্যের ভাবকে পরিপুষ্ট করিত, পরিশেষে তাহারই কথা স্মরণে চিত্তমধ্যে পাপ-বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহারই দর্শনে ক্ষুধিত লালসা গর্জ্জিয়া উঠে, তাহারই স্পর্শনে সর্ব্বদেহমন কামাতুরতার জ্বালাময় বিষে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং কাহারও প্রতি প্রাণের স্বাভাবিক প্রীতি জাগরিত হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, **এই প্রীতিকে দৈহিক মাখামাখির সংস্পর্শ হইতে যথাসাধ্য মুক্ত রাখিতেই হইবে** এবং সেইজন্য প্রয়োজন হইলে বন্ধু-বিচ্ছেদ সহিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আহারীয় নির্ব্বাচন

আহার সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কতকগুলি বস্তুর বিশেষ বিশেষ শক্তি স্বভাবতই রহিয়াছে। যেমন, মদ্যে মত্ততা জন্মায়, নস্যে হাঁচি জন্মায়, লাফিং গ্যাসে (Laughing Gas) হাস্য জন্মায়, লঙ্কায় প্রদাহ জন্মায়। তেমনি কতকগুলি বস্তু আছে, যাহা আহারে প্রত্যক্ষ বা গৌণভাবে কামভাবের প্রবর্দ্ধন হয়। যথা, তাম্বূল, পেঁয়াজ, রসুন, পক্ষি-মাংস, ডিম্ব এবং চা, কাফি প্রভৃতি মত্ততা-কারক দ্রব্য। তাম্বূল-চর্ব্বণ হিতকর নহে, মুখশুদ্ধির জন্য হরীতকীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **অনেকে**

হরীতকী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

বলেন, হরীতকী পুরুষত্ব নাশ করে। তোমাদিগকে বলা প্রয়োজন যে, এই কথা

ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের স্বকপোল-কল্পিত মিথ্যা-ভাষণ মাত্র। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও নিষ্ঠাবতী বিধবাগণ ইহা সেবন করিয়া থাকেন বলিয়াই সংযম-বিদ্বেষী ও বৃথাতঙ্কগ্রস্ত মূর্খ লোকেরা হরীতকী সম্বন্ধে এই অসত্য জনরব রটাইয়াছে। হরীতকী চক্ষুর পক্ষে হিতকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, অগ্নিদীপ্তিকর মেধাজনক ও বৃংহণ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত হইয়াছে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে বলিয়া এবং অপরাপর কতিপয় কারণে **হরীতকী কামশান্তিকর।** "কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা, নোদরস্থা হরীতকী", অর্থাৎ মাতাও সন্তানের উপরে কখনও কখনও কুপিতা হইয়া অনিষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু হরীতকী দ্বারা কখনও কোনও অনিষ্ট হয় না। পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি সেবনে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা জন্মে। অত্যধিক পিঁয়াজ-রসুন সেবনকারীরা দ্রব্যগুণেই সাধারণতঃ উগ্রচেতা ও ক্রূরকর্ম্মা হয়। ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তোমাকে অনেক দূরে যাইতে হইবে না, ডাইনে বাঁয়ে চারিদিকে একটু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেই ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তোমার চক্ষে অজস্র পড়িবে। সুতরাং বীর্য্য-ধারণার্থীর পক্ষে ইহারা বর্জ্জনীয়। ব্যাধিবিশেষে পিঁয়াজ, রসুন, তাম্বূল প্রভৃতি হিতকর হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে এগুলি সুপথ্য বলিয়া বিবেচনা করি না।

সামিষ বা নিরামিষ আহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোনও কথা তোলা আবশ্যক মনে করিতেছি না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব দৈহিক ও মানসিক গঠনের উপরে খাদ্যাখাদ্যের বিচার হইবে। সর্ব্বজনীন ভাবে সামিষ বা নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা দেওয়া অসম্ভব।

সামিষ ও নিরামিষ আহার

তবে এইটুকু নির্ভুল যে, মাছ-মাংস খাও আর না খাও, পিঁয়াজ, রসুন, পক্ষীমাংস ও ডিম্ব প্রভৃতি সাধ্যমত বর্জ্জন করা অধিকাংশ স্থলে আবশ্যক।

আহারীয় নির্ব্বাচন ব্যাপারটা লইয়া ভারতীয় সাধক-সমাজে বড়ই কড়াকড়ি দেখা যায়। কেহ কেহ এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—

"এক মছ্‌লী খায়
কোটি গোদান করে,
তব্‌ভী পাপ নাহি যায়।"

অর্থাৎ "একটী মাছ খাইলে এত পাপ হয় যে, এক কোটি গোদানেও সেই পাপের খণ্ডন হয় না।" কিন্তু "একটুক্‌রা ছাগমাংসসহ রোটী-ভক্ষণ করিলে কতখানি পাপ হয়", তাহার বর্ণনা কোনও প্রবচনে পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই কতকটা ধারণা করা যাইবে যে, মৎস্যাশীদের প্রতি অধিকাংশ ধর্ম্মমতীয়দের কি পরিমাণ বিরক্তি রহিয়াছে। এই বিরক্তির মূল কতটা রহিয়াছে কেবল লোক-প্রথার মধ্যে, আর কতটা রহিয়াছে সত্য সত্য সাধনে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনার মধ্যে, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিতেছে। কারণ, খাদ্যাভাবে দেশের অমৎস্যাশীরা বেদম ও বেপরোয়া মৎস্য-সেবন সুরু করিয়াছে এবং চিরকালের মৎস্যাশীরা ধর্ম্মসাধনা করিবার আকাঙ্ক্ষায় মৎস্য-সেবন পরিত্যাগ করিতেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আহারীয় নির্ব্বাচন প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ রুচি ও প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। যে যেইরূপ কর্ম্ম করিয়া জীবনাতিপাত করিতে অভ্যস্ত, তাহার আহারীয়ের রুচিও তাহার সহিত কতকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে বাধ্য। এই বিষয়ে গীতার

সপ্তদশ অধ্যায়ে অষ্টম, নবম, দশম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ যাহাতে আয়ুঃ, সত্ত্ব (উৎসাহ) বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও রুচি বৃদ্ধি হয় এবং যাহা সরস, স্নিগ্ধ, দেহের সারাংশের উৎপাদক ও তৃপ্তিকর, সেই আহারই সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।"

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারাঃ রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

অর্থাৎ "অতি কটু (তিক্ত), অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (ঝাল), অতি রুক্ষ, বিদাহী (দাহকর সর্ষপাদি), দুঃখশোকরোগপ্রদ খাদ্যই রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।"

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

অর্থাৎ "শীতল, রসহীন, দুর্গন্ধ, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য (অপবিত্র) যে আহার, তাহাই তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।"

সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মানুষের রুচি নিজ নিজ প্রকৃতিরই অনুসরণ করে। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের দ্বারাও তাহা হইলে আহারীয়ের রুচি পরিবর্ত্তন সুসাধ্য ব্যাপার। আর, রজোগুণপ্রধান কার্য্যসমূহেই যদি তোমাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তাহা হইলে রজঃকর্ম্মদ্বারা ক্ষয়িত দেহের রজো-অংশের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ রাজসিক আহার্য্যও গ্রহণের প্রয়োজন পড়িবে। মোট কথা, শরীরের প্রকৃত প্রয়োজন

লোভই ব্রহ্মচর্য্যের শত্রু

না বুঝিয়া লোভবশে আহারীয় নির্ব্বাচন করিও না। **লোভ ব্রহ্মচর্য্যের যত বড় শত্রু, প্রয়োজনবশাৎ গৃহীত এক টুকরা মাছ বা মাংস ব্রহ্মচর্য্যের তত শত্রু নয়।** লোভ-প্ররোচনায় যদি কেহ সাত্ত্বিক খাদ্যও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারাও ব্রহ্মচর্য্যের দারুণ ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে।

লোভবর্জ্জনের আবশ্যকতা

রসনা যে জয় করে নাই, উপস্থ-জয় তাহার সাধ্যাতীত। জিহ্বাকে যে শাসনে আনিতে পারে নাই, ভোগেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাকে সে সহজে শান্ত করিতে পারে না। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত ব্রাহ্মণ মহারাজা যদুকে উপদেশ দিতেছেন,—

"তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্
ন জয়েৎ রসনং যাবৎ, জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।"

(৮ম অধ্যায়; ১১শ স্কন্ধ)

অর্থাৎ "রসনাকে জয় করিতে বাকী রাখিয়া অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিলেও কোনও ব্যক্তিকে জিতেন্দ্রিয় বলা চলে না, কারণ এক রসনাকে জয় করিলেই সকল ইন্দ্রিয়ের পরাজয় এবং এক রসনার প্রশ্রয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয় ঘটিয়া থাকে।"

বলিতে কি, রসনার লোলুপতার নিকট বারংবার পরাজিত হইয়াও যে ব্যক্তি নিজেকে ত্যাগী, সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া প্রচার করে, আমি প্রাণান্তেও তাহার কথা বিশ্বাস করি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানসিক কারণে, প্রক্রিয়াগত কারণে এবং বস্তু-প্রভাবজাত কারণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বীর্য্যক্ষয় হইতে পারে। সুতরাং তোমরা এই কারণগুলি নিয়ত বর্জ্জন করিয়া চলিলেই বীর্য্যক্ষয়ের প্রতিবিধান হইবে। কিন্তু এই কারণগুলিকে বর্জ্জন করিতে হইলে যথোচিত উপায় অবলম্বন আবশ্যক। এই উপায়গুলিও যথাক্রমে মানসিক, প্রক্রিয়াগত এবং বস্তুপ্রভাব-সম্পর্কিত হওয়া প্রয়োজন। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে * সেই বিষয় আলোচনা করিতেছি।

---

* মূল রচনায় "পত্র" ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালে "পরিচ্ছেদ" মুদ্রিত হইয়াছে।

আত্মজয়ের বিদ্যাই
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।
আত্মজয়ী যে,
বিশ্বজয়ী সে।

—স্বরূপানন্দ

মনসংযমের উপায়

বিশ্বামিত্রাদি মহামুনিরও পতন হইয়াছিল, একথা ভাবিয়া তোমরা হতাশ হইও না। উত্থান-পতনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ-সূত্র পরমকারণ শ্রীভগবানের হস্তে। তোমাকে যে পুরুষকার দান করা হইয়াছে, তাহার যথাযথ প্রয়োগ করিয়া তুমি আত্মরক্ষা কর, ইহাই ভগবানের বিধান। তুমি নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য

দৈবাৎ পদস্খলনে হতাশ হইও না

চেষ্টার ত্রুটী করিতেছ না দেখিলে, তিনি স্বয়ং তাঁহার অসীম শক্তির সাহায্য নানা সময়ে নানাভাবে প্রদান করিতে থাকিবেন এবং কচিৎ কদাচিৎ পদস্খলন ঘটিলেও যাহাতে এই অধঃপতন তোমার ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানের গৌণ কারণস্বরূপই হইয়া দাঁড়ায়, তিনি তেমন অবস্থা ও ঘটনাসমূহের সৃষ্টি করিবেন। তিনি কি করিতেছেন, না করিতেছেন, সেই বিষয় বিন্দুমাত্রও বিচারে না আনিয়া সমগ্র পুরুষকারকে জীবন-গঠনে প্রয়োগ কর, নিশ্চয়ই সিদ্ধি তোমার করতলগতা হইবে। বিশ্বামিত্রাদি ঋষির পতন ক্ষণিকের জন্য। পরন্তু অসাধারণ তপশ্চরণের প্রভাবে তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের গৌরবকে পরিশেষে অম্লান ও অপ্রতিহত করিতে পারিয়াছিলেন। তুমিও জীবনের পথে দুর্ভাগ্যক্রমে দুই চারি বার স্খলিতপদ বা ভ্রষ্টব্রত হইলেও নিশ্চয়ই পুনরায় অপরাজেয় গৌরব-কিরণে শোভাদীপ্ত হইতে পারিবেই,—এই বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় বা সন্দেহের প্রশ্রয় দিও না। চিত্তের স্থৈর্য্য যদি কখনও নাশপ্রাপ্তই হয়, হা-হতোস্মি

সর্ব্বদা সজাগ থাক

করিও না, বরং তীব্রতর প্রয়াসে ভবিষ্যৎ জীবনটুকুকে এমন ভাবে সুগঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও, যেন আর কখনও চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়া তোমার জীবন-সমৃদ্ধিতে দৈন্যের কলঙ্কিত প্রলেপ মাখিয়া দিতে না পারে। সর্ব্বদা সজাগ থাক। যে গৃহস্থ সজাগ থাকে, তার ঘরে চোর প্রবেশ করিতে পারে না। আর যদিও প্রবেশ করে, তবে অচিরেই শূন্য হস্তে পলায়ন করে।

মনের প্রভু হও

মন তোমার ভৃত্য। এই ভৃত্য যদি তোমার আজ্ঞাবহ ও বশীভূত থাকে, তাহা হইলে কাম-চোর তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে ভয় পাইবে। কারণ, বিশ্বাসী ভৃত্য জীবনদানেও প্রভুর গৃহকে তস্করের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবেই। পরন্তু, মনরূপ ভৃত্য যদি তোমার বশীভূত না থাকে, যদি তোমার বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে কাম চোর মনের সঙ্গে চুরির বখ্‌রা ঠিক করিয়া নিশ্চিন্তে তোমার গৃহে সিঁদ কাটিতে থাকিবে। এই জন্য ভৃত্যটিকে বশে রাখিবার জন্য যতগুলি উপায় সম্ভব, তাহার প্রত্যেকটি তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে। একটি কাজে যদি তাহাকে তোমার আজ্ঞাবহ করিতে পার, একটীমাত্র আদেশ পালনে যদি একবার সে অকপটভাবেই তোমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলেই জানিবে যে, আর একটী কাজেও তাহাকে আজ্ঞাবহ রাখা সম্ভব হইবে। পরন্তু, যদি কোনও কাজে সে তোমার বিদ্রোহ করিতে চাহে, তবে জানিও, আর একটী কাজেও সম্ভবতঃ সে সেইরূপ করিবে।

এই জন্য মন সম্বন্ধে দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে; প্রথমতঃ কোন্ কোন্ কাজ সে ভালবাসে, দ্বিতীয়তঃ কোন্ কোন কাজ করিবার সময় সে বিদ্রোহ করে। চাকর নিযুক্ত করিয়া প্রথম দিনই তাহাকে সুকঠোর শ্রমকর কার্য্য দিতে নাই, দুই দশ দিন অল্পশ্রম-সাপেক্ষ সুখজনক কার্য্যগুলি করাইয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হয়। প্রথম দিনই কঠোর কাজ কাঁধে চাপাইয়া দিলে বিদ্রোহ নিতান্তই স্বাভাবিক; আর এমন বিদ্রোহকে দোষও দেওয়া যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে কাজের গুরুত্ব বাড়াইতে থাকিলে, সহ্য করাইয়া করাইয়া কঠোরতর দিকে নিলে যদি বিগড়াইতে চাহে, তবে তাহার সহিত জবরদস্তি করিতে হইবে, চাবুক মারিয়া তাহাকে ঠিকমত চালাইতে হইবে। সামরিক বিভাগে সামান্য বিদ্রোহেরও প্রচণ্ড দণ্ড হয়, কথায় কথায় ফাঁসির হুকুম বা গুলি করিয়া মারিবার ব্যবস্থা হয়।

মনকে বশীভূত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ভগবদুপাসনা। উপাসনা কাহার পক্ষে কিরূপ হইবে, তাহা যার যার ব্যক্তিগত চরিত্র এবং পূর্ব্ব-সংস্কারের উপর নির্ভর করে। এই জন্যই সর্ব্বজনীনভাবে কোনও উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে। তবে, এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার নিখিল গুণগ্রামের প্রশংসা দ্বারা তাঁহার মহিমা চিত্তমধ্যে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিয়া কল্যাণ ও অভ্যুদয় প্রার্থনা করিতে পার।

ভগবদুপাসনা

নামজপ

যাহারা নামজপে রুচিমান্, তাহাদের পক্ষে গুণ—প্রশংসা ও প্রার্থনার প্রয়োজন করে না, ভগবানের

যে-কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট নাম একনিষ্ঠভাবে ভক্তিভরে বারংবার জপ করিতে করিতেই তাহাদের কল্যাণের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া যায়। যদি দীক্ষিত হইয়া থাক, তবে গুরুদত্ত নামই তোমার চরম অবলম্বন, আর কোনও দিকে দৃষ্টি দিবার তোমার আবশ্যকতা নাই। আর কোনও নাম বা আর কোনও সাধন-প্রণালীর প্রতি তোমার কৌতূহলাক্রান্ত চক্ষে চাহিবার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই। যাহা তুমি পাইয়াছ, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাহাই তোমার পরমধন, তাহাই তোমার চির-সর্ব্বস্ব। দীক্ষালাভের পরেও যাহারা নিত্য নূতন নাম চাখিয়া বেড়ায়, তাহাদের মত হতভাগ্য আর কেহ নাই। সুতরাং দীক্ষিতের পক্ষে দীক্ষাপ্রাপ্ত নামেই পূর্ণ নিষ্ঠা রাখিতে হইবে। আর যদি দয়াল গুরুর কৃপালাভ নাও করিয়া থাক, তবু তোমার নামজপে কোন বাধা থাকিতে পারে না। **যে নামটী তোমার প্রাণে পরমানন্দদায়ক, যে নামটী তোমার জীবনে পরমাশক্তির উৎস, সেই একটী মাত্র নামকে তুমি দিনের পর দিন ক্রমবর্দ্ধনশীল সুগভীর নিষ্ঠার সহিত ত্রিসন্ধ্যায় এবং শয়নকালে নিবিষ্টমনে জপ করিতে থাক।** অনেকে হয়ত তোমাকে বলিবে,—

অদীক্ষিতের তপস্যা

অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা বৃথা যায়, প্রস্তরে উপ্তবীজের মত নিষ্ফলতাই লাভ করে। কিন্তু সেকথা তুমি শুনিও না। যত দিন পর্য্যন্ত শ্রীগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় লাভের জন্য তোমার অন্তরে অদম্য প্রেরণা না জাগিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক পথে হাতে ধরিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য একজন পরার্থে পরমার্থ-উৎসর্গ-কারী নিষ্কিঞ্চন পথ-প্রদর্শকের জন্য প্রাণ না কাঁদিবে, ততদিন পর্য্যন্ত

যাকে তাকে গুরুবরণ করিও না

কাহাকেও তোমার গুরু বলিয়া স্বীকার করিও না এবং **লোক দেখাইবার জন্য বা মনকে ফাঁকি দিবার জন্য কিম্বা কাহারও বাক্‌চাতুরীতে ভুলিয়া অথবা কাহারও কূট কৌশলের জালে আটক পড়িয়া দীক্ষা গ্রহণ করিও না।** কারণ, সুদীক্ষা দীক্ষাদাতার অকপট হিতৈষণা এবং দীক্ষা-প্রার্থীর অকৈতব আত্মসমর্পণ ব্যতীত, নিষ্পন্ন হয় না। সদ্‌গুরু লাভ করিতে হইলে, সদ্‌-গুরুর উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতাও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়। নিজ অভিমত অনুযায়ী নাম-জপ করিতে করিতে যখন তোমার মধ্যে সাধন-নিষ্ঠারূপ যোগ্যতার কিছু সঞ্চার আরম্ভ হইবে, তখন দেখিও কেমন অপূর্ব্বভাবে তোমার সদ্‌গুরু লাভ হইয়া যাইবে। সিদ্ধ-মহাপুরুষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ওঙ্কারনাথ পাহাড়ের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীমৌনী বাবা প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষেরা প্রথম জীবনে গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। পরন্তু যথাভিমত সাধন করিতে করিতে এমনই ঘটনা ঘটিল যে, গোস্বামীমহাশয় স্থূলভাবে এবং মৌনী বাবা সূক্ষ্মভাবে সদ্‌গুরুর কৃপা ও শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। বলিতে কি হইবে যে, দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে ইঁহারা যত সাধন-ভজন করিয়াছিলেন, সব বৃথা গিয়াছিল? না, ইহা বলিতে হইবে না। বরঞ্চ ইহাই বলিতে হইবে যে, প্রাক্তন সাধনের কণামাত্রও ব্যর্থ হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা এমন গুরুর কৃপা পাইয়াছিলেন, যাঁহাদের সাধনের শক্তি এবং আশীর্ব্বাদের প্রভাব অদৃশ্যভাবেই শিষ্যের সাধন-জীবনকে উত্তরোত্তর

নিত্য-নব সার্থকতায় সুন্দরতর করিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠ গুরু যদি পাইতে চাহ, তাহা হইলে অপেক্ষা করিও এবং **অপেক্ষাকালটুকু সযত্নে স্বাভিমতানুযায়ী সাধনভজন চালাইও।** কারণ, আলস্যের জন্য ত্রিজগতের কোথাও কোনও পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয় নাই।

"শ্রীগুরু-নির্ভরে শ্রীনাম উজ্জ্বল"—একথা বেদবাক্য-বৎ অভ্রান্ত সত্য। তপস্বীর মুখোচ্চারিত মহামন্ত্র সততই সাধকের সহজাত শ্রদ্ধা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতিকে আকর্ষণ করে। যিনি নিজে যে মন্ত্রটী নিয়া যে ভাবটী নিয়া তপঃসাধন করিয়াছেন, তাঁহার কাছ হইতে সেই মন্ত্রটী

গুরুকরণের উপযোগিতা

ও সেই তত্ত্বটী লাভ করিতে পারিলে, সাধনের পথে রুচিহীন মন বারংবার সদ্‌গুরুর তপঃপূত জীবনের মোহন-সুন্দর তেজঃপূর্ণ জীবনের—আদর্শ ও আলেখ্য দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সাধন-বিঘ-কুঞ্জের সুখপ্রদ সুশীতল ছায়ার নীচে আসিয়া বসিতে রুচিমান্ হয়, প্রলুব্ধ হয়। এইখানেই গুরুকরণের প্রকৃত আবশ্যকতা। ধনী ব্যক্তির পুত্র যেমন কতক সুখ-সম্পদ-সৌভাগ্যের অধিকার শুধু পৈতৃকতা হইতেই প্রাপ্ত হয়, শক্তিশালী গুরুর শিষ্যও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্মভাবে গুরুর অর্জ্জিত তপঃসম্পদের কিয়দংশ অনায়াস-লব্ধ সম্পদের ন্যায় বিনাশ্রমে প্রাপ্ত হইয়া সাধন-জীবনের বিরাট ও সুদীর্ঘ অভিযানের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় পাথেয়ের বলে বলীয়ান্ হয়। ইহাও গুরুকরণের অন্যতম উপযোগিতা। কিন্তু তাই বলিয়া যখন-তখন যার-তার কাছে যেমন-তেমন করিয়া একটা দীক্ষা লইয়া ফেলিলেই "কেল্লা ফতে" হইয়া গেল, এমন নহে। কন্যা-দানের পূর্ব্বে কনের পিতা যেমন বরের দোষগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

অনুসন্ধান করিয়া তৎপরে বিবাহ সংঘটন করেন, দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বেও গুরু সম্বন্ধে তদ্রূপ সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইবার পরে সম্যক্ আত্মসমর্পণ উচিত। বরং গুরুকরণ দুই চারি বৎসর বিলম্বেই হইল, তাহাতে কিছু যায় আসে না, বহু জন্ম যদি বৃথাই কাটিয়া থাকে, তবে দুই চারি বৎসরে আর বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটিবে না, পরন্তু চাই এমন গুরু, যিনি সত্যই নিজ-কৃপাগুণে ত্রিলোক উদ্ধারে সমর্থ। "গুরু" "গুরু" করিয়া ব্যস্ত হইও না, পরম-গুরু পরমাত্মার পাদপদ্মে তোমার প্রাণের আকুল বেদনা অহর্নিশ অফুরন্ত আবেগে অকপট ধীরতায় কেবলই নিবেদন করিতে থাক, বিশ্বগুরুর বিরাট হৃদয় তোমার আকুলতার আকর্ষণে অধীরতা-বিহ্বল করিয়া তোল, যে নাম তুমি নিজেই জান, সেই নাম ধরিয়াই তাঁকে তুমি প্রাণ-উজাড়-করা ভালবাসা সহকারে মুহুর্মুহুঃ ডাকিতে থাক, যে রূপটী তাঁর তুমি নিজেই জান, আত্ম-বিসর্জ্জনের ব্যগ্র ব্যাকুলতা সহকারে সেই রূপটীর মধ্যে তোমার সহস্র-দিকে-বিক্ষিপ্ত চিত্তটীকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিবার অনুশীলন অখণ্ড-প্রযত্নে চালাইতে থাক,— একদিন তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেনই। হয় তাঁর স্বরূপে তিনি তোমার নয়নের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন, নতুবা সদ্‌গুরুরূপে আসিয়া তোমাকে পদাশ্রয় প্রদান করিয়া তোমার জন্মজীবন সার্থক করিবেন।

গুরুকরণের পূর্ব্বে গুরু-পরীক্ষা কর্ত্তব্য

তোমার নিজ-নির্দ্দিষ্ট উপাসনার প্রণালীতে যদি কোনও ত্রুটী বা অসম্পূর্ণতা থাকে, নিশ্চিত জানিও, একদিন এই ভুল কোনও না কোনও উপায়ে সংশোধিত হইবেই। তাই, আজ তোমাকে নিজস্ব উপাসনা-

প্রণালীতে একান্ত নিষ্ঠা ও নিঃসংশয়িত বুদ্ধি লইয়া লাগিয়া থাকিতে হইবে। আরও বলি, গুরু যদি ভাগ্যগুণে পাইয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ যতই কটু, অপ্রিয় বা কঠিন হউক, তাহাই অবলম্বন করিয়া সাধন-মার্গে অমিত-বিক্রমে অগ্রসর হইতে তৎপর হও। **দুয়ারে দুয়ারে মন্ত্র চাখিয়া বেড়াইবার কদাদর্শে প্ররোচিত হইয়া সাধনের সুযোগ বৃথা নষ্ট হইতে দিও না।**

দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইও না

মৃত্তিকার সুগভীর তলদেশ হইতে জন্ম-যুগের তৃষ্ণাপহারী সুপেয় সুস্বাদু সুস্নিগ্ধ সলিলের শীতল প্রবাহ যদি বাহির করিতে চাহ, স্থানে স্থানে মাটি খুড়িও না, স্থানে স্থানে কূপ খননের চেষ্টা পাইও না, একটী স্থানেই অবিশ্রাম অধ্যবসায়ে, অমিত বিক্রমে শাবল চালাইতে থাক এবং "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—পরম প্রার্থনীয় লাভ করিয়া তবে প্রতিনিবৃত্ত হও। শিষ্য-সংগ্রহের লোভবশাৎ ব্যাধবৎ সুকৌশলী ব্যক্তি যদি তোমার পূর্ব্বপ্রাপ্ত সাধনের প্রতি রুচি ও শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিবার জন্য শাস্ত্র বা যুক্তির বাগুরা বিস্তার করিতে চাহে, তুমি কিন্তু দূরে সরিয়াই আত্মরক্ষা করিও। বৃথা-বচন-বিন্যাসে কাণ দিয়া যে সময় নষ্ট করিবে, সেই সময়টুকু তোমার পূর্ব্ব-প্রাপ্ত সাধনই একাগ্রতার সহিত বসিয়া করিলে বিনা যুক্তিতে বিনা কুতর্কে বিনা বিচারে আপনা-আপনি মনের কুহেলিকা ও কুয়াসা-তমসার আবরণ অপসারিত হইবে।

উপাসনা নীরবে, নির্জ্জনে ও নিরুদ্বেগচিত্তে করিবে। বাহিরের দুশ্চিন্তা মনকে আকৃষ্ট করিতে চাহিলেও বলপূর্ব্বক তাহাকে ভগবানে সংলগ্ন করিবে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়লিপ্সা হইতে টানিয়া আনিয়া

পরমানন্দ ব্রহ্মতত্ত্বে নিয়োজিত করিবে। পবিত্র

উপাসনার নিয়ম

স্থানে সুখাসনে সরল মেরুদণ্ডে উপবেশন করিয়া দেহকে অচঞ্চল রাখিয়া শান্তভাবে ভগবচ্চিন্তা করিবে। "ভগবচ্চিন্তা যে বজ্রাগ্নির মত নিমেষ-মধ্যে সকল অপবিত্রতা ও অধঃপতনের ধ্বংস করে, ভগবদ্-ধ্যানের দ্বারা দেহ, মন, চিত্ত, আত্মা এবং প্রাণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই যে বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, **ভগবৎ-সাধনা যে কখনও ব্যর্থ হয় না, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিতে করিতে উপাসনা করিবে। নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ একই সময়ে উপাসনায় বসিতে চেষ্টা পাইবে** এবং উপাসনা করিতে করিতে

উপাসনার শক্তিতে বিশ্বাস কর

চিত্তপ্রসাদ বা **প্রশান্তি না আসা পর্য্যন্ত সাধন করিতে থাকিবে।** নামজপ করিতে হইলে জপের পূর্ব্বে একবিংশতি বার যোনি-মুদ্রার অভ্যাস করিয়া দেহের অধোদেশে সমাগত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ওঙ্কার-যোগে ভ্রূমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া তৎপরে ব্রহ্মকর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিবে। এইভাবে দিনের পর দিন নিয়মিত উপাসনার দ্বারা যে আত্মিক শক্তির ক্রমশঃ স্ফুরণ হইতে থাকিবে, তাহারই বলে মন বশীভূত হইবে। অবশ্য, প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে বলিয়া রাখাই প্রয়োজন যে, নামজপই উপাসনার মুখ্য অংশ এবং নামজপের পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়া করণীয়, তাহা নামজপে অভিনিবেশ ও নিবিষ্টতা বর্দ্ধনেরই জন্য ব্যবস্থাপিত। সুতরাং জপনীয় নাম-সম্পর্কে অবিচলিত একনিষ্ঠা ও সুগভীর বিশ্বাস একান্ত আবশ্যকীয়। এক এক

নামে নিষ্ঠা

দিন এক এক নাম জপিবার চেষ্টা করিয়া

সাধন-কল্পতরুর অমৃতময় ফললাভের প্রত্যাশা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায় দুরাশামূলক নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। মনে না রাখিলেই চলিবে না যে—

বারংবার করে যারা মন্ত্রের বদল,
সাধন করিয়া পায় অষ্টরম্ভা ফল।

কথায় বলে,

"এক সাধে ত সব সাধে ;
সব সাধে, সব যায়।"

(কবীর সাহেব)

কাজে নামিয়া একটা পথ ধরিয়া তাহার পরে আজ এক বন্ধুর অনুরোধে আর একটু নূতনত্ব করিলাম, কাল এক খুল্লতাতের পরামর্শে আরও একটু নূতনত্ব করিলাম, পরশু এক মহাপুরুষের উপদেশে আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইলাম, তরশু আবার পাড়ার বারোয়ারী তলায় গিয়া মনটা কেমন উদাস হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা নূতনত্ব করিলাম, এইভাবে চলিয়া কেহ কখনও সাধনবৃক্ষের অমৃতময় ফল আহরণ করিতে সমর্থ হয় না। যে নাম ধরিয়াছ, মর কি বাঁচ, পড় কি ওঠ, শত জন্ম বৃথা হইয়া গেলেও এ নাম ছাড়িবে না। এমন জিদ নিয়া চলিতে হইবে।

মনকে বশীভূত করার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপায় প্রাণায়াম। ইন্ধন না যোগাইলে যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ঠিক তেমনি প্রাণবায়ুর স্পন্দন রোধ করিতে পারিলেও মনের চাঞ্চল্য নির্ব্বাপিত হয়। কি যে অপূর্ব্ব

প্রাণায়াম

সূক্ষ্মদর্শিতার প্রভাবে আমাদের পরমযোগী পূর্ব্বপুরুষগণ এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া

পড়িতে হয়। প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করিবার বহু সহস্র কৌশল তাঁহারা উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণায়ামের সকল প্রণালী সকলের উপযোগী নহে। সুতরাং প্রকৃত পারদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাণায়াম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবে। যাহারা এই সম্বন্ধে সদ্‌গুরুর কোনও উপদেশ পাও নাই, তাহারা **পুস্তক পড়িয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে যাইও না**। কারণ, তাহাতে বিপদ আছে। তবে, যাহাতে ভবিষ্যতে উপযুক্ত উপদেশ লাভের সুযোগ ঘটিলে উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে অপারগ না হও, তজ্জন্য এখন হইতেই নিয়মিত সময়ে স্থিরাসনে বসিয়া শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করার অভ্যাস করিতে পার। শ্বাসবায়ুর গতাগতির প্রতি মন দিলে অজ্ঞাতসারে প্রাণায়াম করা হইয়া থাকে এবং মনও স্থির হইয়া যায়; অথচ ইহাতে কোনও প্রকার রোগোৎপত্তির আশঙ্কা বিন্দুমাত্র নাই। বিনা চেষ্টাতেই এই প্রাণায়াম হইয়া থাকে বলিয়া ইহার অপর নাম নির্ব্বীজ সহজায়াম (তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

শ্বাস প্রশ্বাসের আগমে নির্গমে লক্ষ্য

হৃৎস্পন্দনের প্রতি মন দেওয়াও মন স্থির করিবার একটী অতি উৎকৃষ্ট কৌশল। অবিরাম রক্ত-সঞ্চালনের যে ধ্বনি হৃৎপিণ্ডে হইতেছে, তাহাকে ইষ্টনাম বা ওঙ্কার বলিয়া কল্পনা করিয়া মনকে সেই ধ্বনির একান্ত অনুসারী রাখিয়া ঐ স্পন্দনের গতি লক্ষ্য করিতে থাকিলে আস্তে আস্তে হৃৎস্পন্দনও নিয়মিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রমশঃ স্থিরতা লাভ করিতে থাকে। ইহার ফলে হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহাদি দর্শন এবং তজ্জনিত অনির্ব্বচনীয়

হৃৎস্পন্দনে লক্ষ্য

প্রেমানন্দ আস্বাদন হইয়া থাকে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতির সহিত ইষ্টনাম-স্মরণ ও ইষ্টমূর্ত্তি-মননের যে পন্থা আছে, তাহা অপেক্ষা এই পন্থাটী অংশতঃ নিকৃষ্ট হইলেও, ইহার স্বাভাবিক সুফলসমূহের অব্যর্থতা-বশতঃ হৃৎস্পন্দন যোগে মনঃস্থৈর্য্যের প্রয়াসও যোগীদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মস্তিষ্ক, হৃদয়, মেরুদণ্ড, কণ্ঠকূপ, নাভিমূল, মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত, লিঙ্গমূল, গুহ্যমূল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে যথাভিমত রূপ-ধ্যানের দ্বারাও মনের প্রশান্তি জন্মে। ধ্যান করিতে বীজমন্ত্র, দেব-মূর্ত্তি, জনক, জননী বা মহাপুরুষমূর্ত্তি প্রভৃতিই প্রশস্ত।

নিজমূর্ত্তি ধ্যান করিতে পারিলে মনঃস্থৈর্য্যের সাথে সাথে রুচিপ্রকৃতি প্রভৃতিও আশ্চর্য্যভাবে অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত হয়। দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন এবং প্রতিফলিত মূর্ত্তির মধ্য দিয়া কি কি চিন্তার স্ফুরণ অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা লক্ষ্য করিতে

আত্মমূর্ত্তি ধ্যান

থাকিলে ইহা দ্বারাও অতি চমৎকার মনঃসংযমের অভ্যাস সাধিত হয়। বিশেষতঃ ইহার ফলে চিত্তবৃত্তির দূষিত তরঙ্গসমূহ দিনের পর দিন পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে থাকে বলিয়া চরিত্রেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সাধু বা আদর্শ-চরিত্র বীর-পুরুষের মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া সেই রূপটীর মধ্যে কল্পনাবলে নিজমূর্ত্তি দর্শনের চেষ্টাতে মনঃস্থৈর্য্যের সাথে সাথে সাধুভাব ও বীরভাব লাভ হয়। অনেকে আছেন, দেব, দেবী, ঈশ্বর ও মহাপুরুষের চিন্তনের দ্বারা মনঃস্থৈর্য্য-সম্পাদন-প্রয়াসের পক্ষপাতী নহেন, গুরুর প্রয়োজন বা গুরুমূর্ত্তিচিন্তনের উপযোগিতা স্বীকার করেন না, কোনও একটা আধ্যাত্মিক কৌশলকে মনঃসংযমের উপায়রূপে গ্রহণ করিবার জন্য

ব্যাকুল। তাঁহাদের পক্ষে আত্মমূর্ত্তি চিন্তনের চাইতে উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছু হইতে পারে না। **আত্মমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতেই ক্রমশঃ রহস্যময় অতীন্দ্রিয় জগতের আশ্চর্য্য কুহেলিকা-জাল ছিন্ন হয়** এবং যাঁহাকে দিয়া তাঁহার জীবনের চরম চরিতার্থতা অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাকে পাইয়া তিনি কৃতকৃতার্থ হন। কারণ, যে পরম-বেদ্য ভগবানকে জানিবার জন্য জীব শীতাতপে উপেক্ষা করিয়া, দিবা-রজনীর ভেদ ভুলিয়া, দুঃখ-সন্তাপ সহ্য করিয়া সুকঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ এক অনির্ব্বচনীয় কৌশলাশ্রয়ে তোমার দেহমধ্যেই বিদ্যমান, তোমার মনে ও প্রাণে, তোমার ভাবে ও ভাষায়, তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস-স্পন্দনে বিরাজমান।—তোমার পার্থিব মূর্ত্তির পানে অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া একবার সেই পরমপুরুষকে খুঁজিয়া দেখ।

নিজের ভিতর দিয়া পরমাত্মার প্রকাশকে লক্ষ্য রাখ

খুঁজিয়া দেখ,—তোমার প্রশান্ত ললাটের উদার বিস্তারের পিছন হইতে কাঁহার বিরাট ধীশক্তির অকাট্য মহিমা নিজেকে প্রকাশিত করিতে চাহিতেছে। খুঁজিয়া দেখ,—তোমার নয়ন ভঙ্গিমার অন্তরাল বাহিয়া কাঁহার সর্ব্বতোব্যাপিনী জ্যোতির্ধারা অপরূপ করুণায় অসীম স্নেহে প্রতিনিয়ত সর্ব্বজীব-কল্যাণকল্পে ঝরিয়া পড়িতে চাহিতেছে। এই যে বাহু সৌষ্ঠব, এই যে তোমার শোভন চারুতা, এই যে তোমার মোহন সৌন্দর্য্য,—ইহা কাঁহার, কোথা হইতে আসিল, কাঁহার প্রতিচ্ছবি?—এইরূপ চিন্তনই আত্মমূর্ত্তিতে চিত্তাভিনিবেশের মধ্য দিয়া পরমমধুর রসাস্বাদনকে সহজলভ্য করে এবং তাহারই ফলে চিত্ত স্থির হয়।

পূর্ব্বজীবনের সুখকর ও হিতকর ঘটনাসমূহের নিবিষ্ট স্মরণ দ্বারাও মনঃসংযম হয়। পবিত্রতা-পরিব্যঞ্জক স্বপ্নদৃষ্ট প্রীতিজনক বিষয়াদির পুনরনুধ্যানেও একপ্রকারের চিত্তাভিনিবেশ-সামর্থ্য জাগ্রত হইতে থাকে। মহাপুরুষের অলোক-সামান্য জীবন-কথা মনে মনে আলোচনা করিলে আরও অধিক ফল হয়। বৈষ্ণব সাধকেরা অনেকে নামজপের নির্দ্দিষ্ট সময়টী ব্যতীত আর সর্ব্বদাই কেবল

লীলাস্মরণ

কৃষ্ণলীলা এবং রামায়ৎ সাধকেরা রামলীলা স্মরণ করিয়া মন স্থির রাখেন। স্বদেশ-সেবকেরা জাতীয় ইতিহাসের ক্রম মনে মনে আলোচনা করিয়াও এক প্রকারের মনঃস্থৈর্য্য লাভ করিয়া থাকেন।

মেরুদণ্ড সরল করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে, আকাশ, সমুদ্র, সবুজ মাঠ ও অমাবস্যার অন্ধকারের দিকে সহজ অনায়াস-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে, মন সংযমাবস্থা লাভ করে।

আকাশে মনঃসংযম

আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে অভ্যাস করিলে প্রথম প্রথম ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ মেঘ-পটলের দৃশ্য মনকে এক আধটুকু আন্দোলায়িত রাখিলেও অধোমুখী মনোবৃত্তির ঊর্দ্ধগতি-প্রাপ্তি হেতু মন ক্রমশঃ মেঘমালার চঞ্চলতা ভেদ করিয়া অনন্ত অফুরন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুব দিতে সমর্থ হয়। নিরুদ্বেগ মনে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে

সমুদ্রে মনঃসংযম

অভ্যাস করিলে প্রথম প্রথম ঊর্ম্মিমালার অবিশ্রাম চঞ্চলতা মনকে সামান্য পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করিলেও বিরাট বিশাল সেই মহান্ দৃশ্য চপল মনকে যেন নিজের বক্ষে আপনি বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিতে

চাহে,—চঞ্চল চিত্ত নিজের সকল ক্ষিপ্ততা, সচ্চিদানন্দ-সাগরে হারাইয়া স্থির, নিশ্চল, মাতৃবক্ষশায়ী শিশুর মত নির্ভরশীল হয়। দিগন্ত-প্রসারী

প্রান্তরে মনঃসংযম

শ্যামল-শস্পাস্তৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরের দৃশ্য প্রাথমিক বিক্ষিপ্ততা বজায় রাখিলেও সহস্র বিভিন্নতার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হৃৎ-চিত্ত-মনোহর এক বিরাট স্থৈর্য্য আপনি জাগরিত হয়। অমা-রজনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারের

অন্ধকারে মনঃসংযম

দিকে নিরাতঙ্ক নয়নে তাকাইতে থাকিলে গহন তমিস্রার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে থরে থরে আধ-আধ-রেখাময় জ্যোতিঃপুঞ্জ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, ক্রমে তাহা পরমজ্যোতির্ম্ময় জন্মযুগদুঃখহারা আনন্দময়ী মূরতিতে পরিণত হয়, কিন্তু চিত্ত চিরতরে চঞ্চলতা পরিহার করে।

মৌনী হইয়া থাকিলেও, বাক্‌সংযমের ফলস্বরূপ, মন সংযতাবস্থা লাভ করে। বিচিত্র বিষয়াবলিতে সঞ্চরণশীল ক্ষিপ্ত চিত্ত প্রধানতঃ বহুভাষিতারই সহায়ে নিজেকে ক্ষিপ্ততর করে, বাক্যের বৃথা বিলাসই

মৌনাভ্যাসও মনঃসংযম

তাহার চিরচঞ্চল চরণ-ভঙ্গীকে চঞ্চলতর করে,—বাক্য সংযত হইলে, বাক্‌চাঞ্চল্য শাসিত হইলে এই জন্যই মন আংশিকভাবে সংযমাবস্থাও প্রাপ্ত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার যদি থাকে মনকে সংযত করিবার জন্য অতিরিক্ত কোনও দৃঢ় সঙ্কল্প বা প্রয়াস, তাহা হইলে তাহা আরও সহজে ফলোপধায়ক হয়। মৌন অভ্যাস করিবার জন্য প্রথম প্রথম দিনের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় বাছিয়া লওয়া সুবিধাজনক।

আহার-কালে, উপাসনা-কালে, দেবদর্শন-কালে, কীর্ত্তনাদি-শ্রবণকালে সভাসমিতির অধিবেশনে শ্রোতৃরূপে অবস্থান-কালে এবং মলমূত্রত্যাগ কালে সম্পূর্ণ মৌন অভ্যাস করিবার প্রথা সজ্জনগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহা মনঃসংযমের সহায়তাকারক। এতদ্ব্যতীত সঙ্কল্পপূর্ব্বক দৈনিক অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল মৌনাভ্যাস করিলে এবং মৌনকালে প্রাণপণ যত্নে মনকে মহত্তম ব্রহ্মতত্ত্বে নিবিষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলে মনের অধিকতর স্থিরতা হয়।

মৌন-ব্রতের নিয়ম

সপ্তাহের একটি দিন অথবা পক্ষের একটি নির্দ্দিষ্ট তিথি উদয়াস্ত বা অহোরাত্র মৌন অভ্যাসও হিতজনক। কিন্তু মৌন-ব্রত অবলম্বন করিয়া যদি তৎকালে অত্যধিক বৈষয়িক বিক্ষিপ্ততার মধ্যে নিজেকে লগ্ন করিতে হয়, তবে মৌনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হইয়া যায়। মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক মামলা-মোকর্দ্দমা, পরানিষ্টচেষ্টা, পরশ্রীতে কাতরতা প্রভৃতি মৌনের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। মৌনকালে প্রলোভনের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থান, প্রলোভন-বর্দ্ধক বাক্যশ্রবণ, লালসা-প্ররোচক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, কামোদ্দীপক দৃশ্য-দর্শন, ইতরসুখভোগাতুরতার অনুশীলন মৌনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

চক্ষুকে পলকহীন করিতে চেষ্টা করিলে মনও সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতাহীন হয়। কিন্তু চক্ষুকে পলকহীন করিবার কৌশলটী কি? ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশনই সেই কৌশল। অথবা মনকে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ ভাগে রাখিয়া চক্ষু খোলা রাখিলে দীর্ঘসময় অপলক নেত্রে থাকা যায়।

যে কোনও বস্তুর প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ত্রাটক-যোগ অভ্যাস করিলে অথবা শিবনেত্র হইয়া অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিয়া

অভিপ্রেত ধ্যান করিলে মন সংযত হয়। **কিন্তু ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিবার ব্যাপারে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন চক্ষের শিরা ও উপশিরাগুলি কখনও উৎপীড়িত না হয়।** চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভ্রূমধ্যে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিলেই বিনা কষ্টে আস্তে আস্তে আপন দৃষ্টিও ভ্রূমধ্যে স্থির হইবে। সাধক-সমাজে ভ্রূমধ্যের বড় আদর, যোগশাস্ত্রে ভ্রূ-মধ্যের বড় সম্মান। কেহ বলেন, ইহা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলন-স্থান। তাই, তাঁহারা ইহাকে ত্রিবেণী-সঙ্গম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ বলেন,—এইখানে মন স্থির করিয়াই মহাদেব মদন-ভস্ম করিয়াছিলেন, ইহাই তৃতীয় নয়ন বা দিব্য-নেত্র। আজও এইখানে মন স্থির করিয়া শিবতুল্য যতি পুরুষেরা অনায়াসে মন্মথের আস্ফালনকে স্তব্ধ করিয়া স্বকীয় জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন,—এ কথায় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই।

ভ্রূমধ্যে মনঃসংযম

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দানের এত প্রশংসা শুনিয়া গুরুহীন শিক্ষার্থীরা চক্ষুর উপরে বল প্রয়োগ করিতে গিয়া অনেক সময় বিপন্নও হইয়াছেন। কারণ, চক্ষুর সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে, অপথে চেষ্টা চলিলে মস্তিষ্ক-বিকৃতি অসম্ভব নহে। সুতরাং মনঃস্থৈর্য্যের বলেই চক্ষুকে ভ্রূ-মধ্যসেবী করিতে হইবে, **গায়ের বলে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিতে যাইও না।** সহজ, সরল অক্লেশদায়ক উপায়েই মনকে ভ্রূমধ্য-সেবী করিতে হইবে। ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আমার পরমদয়িত পরম-প্রাণারাম প্রেমময় প্রাণ-পুরুষ তাঁর মোহন মুরলি করযুগে ধরিয়া ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া আছেন, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আমার জীবনদাত্রী জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী শ্যামা মা বরাভয়-করে স্মিত-রুদ্র-হাস্যে

স্নেহকরুণোজ্জ্বল দৃষ্টিতে মন্মথবিধ্বংসিনী মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে শোভমানা, আমার চির-জীবনের পরমসুখদাতা, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ও নিত্যভয়ত্রাতা, পরমানন্দকন্দস্বরূপ ও অকৈতবপ্রেমদাতা, ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণকারী ও সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা, আপনার আপন ও জীবনের জীবন সদ্গুরু আজ ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে বিরাজমান।—এইরূপ চিন্তা আবেগাকুল অনুরাগ সহকারে করিতে করিতে আপনি মন ভ্রূমধ্যে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। মনকে ভ্রূমধ্যসেবী করিবার পক্ষে ললাটে শীতল জলের বিন্দু, কর্পূরের তিলক বা চন্দনের ফোঁটা-ব্যবহারও বাহ্যতঃ এক উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু **সেই ফোঁটাটী ঠিক ভ্রূমধ্যেই পড়া দরকার,** সমস্ত কপাল জুড়িয়া নহে।

সঙ্গীতে মনঃসংযম

সঙ্গীত মনঃসংযমের এক সুন্দর উপায়। এই জন্যই বুঝি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনের উপর এত বড় জোর দিয়াছিলেন। রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রসঙ্গত আলাপে মনের যে স্থিরতা জন্মে, সঙ্গীতের উচ্চ স্তরে যাঁহারা প্রবেশ লাভ করেন নাই, তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না। আলাপের এমন অদ্ভুত মনোনিয়ামিকা শক্তি যে জপ-ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা যেমন নানা বিভূতি দর্শন হয়, সঙ্গীতেও তাহাই হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে,—"গানাৎ পরতরং ন হি।" নারদ, মীরাবাঈ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র সাধক সাধিকা সঙ্গীতের শক্তিতেই সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য, তাঁহারা শুধু সঙ্গীতই করিতেন না, সঙ্গীতের দ্বারা ভাবের পরিপুষ্টিই তাঁহাদের সাধনা ছিল। রাসভ-বৎ চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেই সঙ্গীত হয় না, দিবারাত্রি উটপক্ষীর কাকলীতে প্রতিবেশীদের

শান্তিভঙ্গ করিলেও কীর্ত্তন হয় না, অর্থহীন, ভাবহীন, চিত্তমাধুর্য্য-বর্দ্ধনে চেষ্টাহীন, মঙ্গল মধু-পানে উল্লাসহীন কতকগুলি শব্দসমষ্টির প্লুতস্বরে বা স্বর-বৈচিত্র্য-সহকারে উচ্চারণও সঙ্গীত-পদবাচ্য নহে। প্রত্যেকটী শব্দোচ্চারণ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অশরীরী আনন্দের পীযূষস্বাদু উল্লাস ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবে, প্রত্যেকটী রাগ-মাধুরী অন্তরের অস্ফুট ভাবাবেশকে জাগাইয়া তুলিবে, যাদুকরের মোহনদণ্ড-স্পর্শে উদ্ধতফণ সর্পবৎ আক্রোশ-পরায়ণ রিপুকুলের গর্ব্বিত শির ধূলায় লুটাইয়া দিবে,—ইহাই সঙ্গীত, ইহাই যোগের সাধক, ইহাই যোগের অঙ্গ, ইহাই মনঃস্থৈর্য্যের সম্পাদক।

কণ্ঠ-সঙ্গীতের যোগ্যতা সকলের থাকে না। তাহাদের পক্ষে যন্ত্র-সঙ্গীত অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু তাই বলিয়া সকল যন্ত্রেই সমান মনঃস্থৈর্য্য হয় না। হারমনিয়ম প্রভৃতি এই হিসাবে যন্ত্রই নহে, খেলনা মাত্র। মনঃস্থৈর্য্য-লাভের পক্ষে তারের যন্ত্রই অধিক উপযোগী।

যন্ত্র-সঙ্গীত ও মনঃসংযম

সেতার, সুরবাহার, স্বরদ বা বীণার প্রত্যেকটী ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া আমার প্রাণারাম পরমাভীষ্টের মধুময় নামেরই যেন অপূর্ব্ব ঝঙ্কার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে, রাগরাগিনীর আরোহণ ও অবরোহণের সহিত আমারই সকল-সুখ-বিধাতার চির-মঙ্গল-মধুমাখা সুধাময়ী বাণী যেন মুরছিয়া পড়িতেছে, তারের টঙ্কারে টঙ্কারে যেন পরমপ্রেমম্রক্ষিত ইষ্টনাম চারুচরণ-ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া চলিতেছে, এইরূপ মনন-সহকৃত যন্ত্রসঙ্গীত শ্রবণেও মনের আশ্চর্য্য স্থৈর্য্যলাভ হইয়া থাকে।

মনের স্বভাব চঞ্চলতা। এইজন্য চঞ্চলতার মধ্য দিয়াই তাহাকে স্থিরত্বে আনয়ন করা একটা অত্যুৎকৃষ্ট কৌশল বটে। সঙ্গীত, স্তোত্র-পাঠ, দেবলীলা স্মরণ, যোগীদের ষট্‌চক্রভেদ এবং মাতৃকা-মালা-জপ প্রভৃতিকে প্রকৃত প্রস্তাবে মনকে গমনশীলতার সুযোগে বশীভূত করিবার জন্যই সাধনাঙ্গরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণ

অযাচক আশ্রমভুক্ত অখণ্ড-সাধকেরা এক "শক্তি-সঞ্চালিনী" প্রক্রিয়া অবলম্বনে বিচরণশীল মনকে **পরিভ্রমণের** মধ্য দিয়াই শান্ত করেন। তাঁহারা উপাসনা করিতে বসিয়া প্রথমতঃ বিধি অনুযায়ী স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া লইয়া তিনবার অথবা দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করেন। তৎপরে লিঙ্গমূলে মন স্থির করিয়া ভাবনা করেন যে,—"এই দেহটা আমি নহি, দেহ আমার শক্তি প্রকাশের যন্ত্র।" তৎপর একুশ বার অশ্বিনীমুদ্রা অথবা যোনিমুদ্রা প্রভৃতি গুহ্য ও লিঙ্গাদির ব্যায়াম-জনক মুদ্রাদি অভ্যাস করিয়া "**ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি**" "**আমি জগতের কল্যাণকারী হইতেছি**"—এইরূপ সংকল্প করিতে করিতে মনকে প্রথমত লিঙ্গমূলে (অর্থাৎ জননাঙ্গের যে অংশ নিম্নোদরের ভিতরে রহিয়াছে, তাহার শেষ প্রান্তে) স্থির করেন। তৎপর ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রে (অর্থাৎ জননাঙ্গের যে অংশ নিম্নোদরের বাহিরে থাকে, তাহার সম্মুখের দিকের শেষ প্রান্তে) মনকে সঞ্চালিত করিয়া সে স্থান হইতে পুনরায় লিঙ্গমূলে আসিয়া তৎপর বাম অণ্ডকোষে, সে স্থান হইতে বামপদে, অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে পদনখাগ্রগুলি হইয়া কোমর দিয়া মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে, মেরুদণ্ড দিয়া স্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বামহস্ত ও অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে হস্তাঙ্গুলী-সমূহের শেষ সীমায়, তৎপর স্কন্ধ ও ঘাড়ের উপর দিয়া

মস্তিষ্কে, মস্তিষ্কে একটু বেশী সময় থাকিয়া-থাকিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় ঘাড়ের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে ও অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে যাবতীয় হস্তাঙ্গুলীতে তৎপর মেরুদণ্ড দিয়া দক্ষিণপদের অগ্রভাগ ও অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে পদাঙ্গুলী হইয়া দক্ষিণ কুচ্‌কির ভিতর দিয়া দক্ষিণ অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষ হইতে পুনরায় লিঙ্গাগ্র হইয়া লিঙ্গমূলে মনকে তাঁহারা ভ্রাম্যমাণ রাখেন।

পরিভ্রমণকালে অযাচক-আশ্রমীরা সর্ব্বদাই জগন্মঙ্গল-সংকল্প রক্ষা করেন এবং এইভাবে প্রয়োজন অনুসারে তিনবার, সাতবার অথবা অসংখ্যবার পরিভ্রমণের পরে লিঙ্গমূলে আসিয়া মেরুদণ্ড দিয়া মস্তিষ্ক হইয়া ভ্রূমধ্যে মন স্থির করিয়া নাম-জপে লাগিয়া যান। প্রথম সময়ে বহুবার পরিভ্রমণের পরে মনে স্থিরতার আবেশ আসে, কতিপয় দিবস নিয়মিত অভ্যাসের পরে সাতবারে, পরে তিনবারে এবং ভালমত অভ্যাসের ফলে একবারেই মনটী স্থির ও বাহ্য চিন্তার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাতে পরিভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া অফুরন্ত নাম-জপে আত্মবিনিয়োগ কর্ত্তব্য।

ষট্‌চক্রভেদেরও ফল কতকটা পরিভ্রমণেরই ন্যায়। কিন্তু **পরিভ্রমণ-অভ্যাসকারীর পক্ষে ষট্‌চক্রভেদ বা মাতৃকা-মালা-জপ প্রভৃতি একান্তই অনাবশ্যক।** ষট্‌চক্রভেদাদি অপেক্ষা **পরিভ্রমণ** সহস্রগুণ সহজে আয়ত্ত হয় এবং ইহা অধিকতর দেহ-বিজ্ঞান-সম্মত। **পরিভ্রমণ** শুধু চিত্তকেই প্রশান্ত করে না, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-কল্যাণের উদ্দীপনা এবং দেশ ও সমাজ-সেবার প্রেরণাকে মুহুর্মুহুঃ জাগরিত করিতে থাকে। পরিভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল নিঃস্বার্থপরতার বৃদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধির ক্ষয়। পরিভ্রমণ-কালে জগন্মঙ্গলের যে সঙ্কল্পবাক্য

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনে মনে উচ্চারিত হইতেছে, তাহা দ্বারা শরীরের প্রত্যেকটী অংশে অতি সূক্ষ্ম আণবিক পরিবর্ত্তন-সমূহ সাধিত হইবে এবং শরীর-মধ্যে যে সকল তামসিক অণু-পরমাণুর অবস্থিতিহেতু দেহ-দ্বারা পরার্থমূলক কর্ম্ম সম্ভবপর হইয়া উঠে না, দেহ স্বার্থ-মূলক কর্ম্মে অনলস হইলেও যে সকল কদর্য্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অনু-পরমাণুর প্রভাব দেহকে পরার্থমূলক কর্ম্মে কর্ম্মঠ, রুচিসম্পন্ন বা সুপটু হইতে বাধা দিতেছে, জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের দ্বারা তাহাদের শক্তি বিধ্বস্ত হইবে এবং শরীর-মধ্যে সাত্ত্বিকী শক্তিবিশিষ্ট অণু-পরমাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে। অধিকন্তু, ষট্‌চক্রভেদাদির কালে কাহারও কাহারও দেহের বিভিন্ন চক্রে যেমন নানাপ্রকার যোগ-বিভূতির দর্শন হইয়া থাকে, অগ্রসর সাধকের পক্ষে পরিভ্রমণকালে তেমনি সুখপ্রদ জ্যোতির্ম্ময় দর্শনসমূহ শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মগ্রন্থিতে, প্রত্যেক অস্থিতে, স্নায়ুতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিলব্ধ হইয়া থাকে।

পুস্তক দেখিয়া এই পরিভ্রমণ অভ্যাস করা অসুবিধাজনক। কারণ, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে। ষট্‌চক্রভেদে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিলে বিপদ অনিবার্য্য, কিন্তু পরিভ্রমণে সেই ভয় বিন্দুমাত্রও নাই। জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণের ক্রম অনুশীলনে তোমার কোনও ত্রুটী বা অসম্পূর্ণতা ঘটিলে তাহার জন্য দৈহিক বা মানসিক কোনও রোগ বা প্রতিক্রিয়া ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, যদিও সঠিকভাবে অনুশীলিত হইলে তাহার সুফল অসীম ও অবশ্যম্ভাবী। এজন্যই গুরূপদেশ আংশিক আবশ্যক। এই পুস্তকে যৌগিক জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণের কোনও বিষয় প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া বিস্তারিত উদ্‌ঘাটিত হইল। অভিনিবেশপূর্ব্বক বারংবার পড়িয়াও যদি সাধক উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহা হইলে

মনকে সাধারণভাবে শরীরের মধ্যে অবিরাম ভ্রমণশীল রাখিতে চেষ্টা করিবে। শরীরের নিম্নতর অংশ হইতে বামাঙ্গ বাহিয়া মন ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং শরীরের ঊর্দ্ধ অংশ হইতে দক্ষিণাঙ্গ বাহিয়া নিম্নে নামিবে। * এই ভাবে অবিরাম অবিশ্রাম মন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া ক্রমে আপনি শান্ত হইবে। ইহা কিছুদিন অভ্যাস করিবার পরে যৌগিক জগন্মণ্ডল-পরিভ্রমণ ব্যাপারটী সহজায়ত্ত হইয়া যাইবে।

মনঃস্থৈর্য্য সাধনের নিম্নলিখিত উপায়গুলি নিশ্চিন্তে অবলম্বন করিতে পার।

পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের ধ্যান

(১) পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত ও কৃষ্ণ-বর্ণের ধ্যান করিবে। নিবিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে যেই দেখিবে যে কৃষ্ণবর্ণই শুধু মনে পড়িতেছে, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে আবার শুভ্রবর্ণের চিন্তা আরম্ভ করিয়া দিবে। আবার শুভ্র-বর্ণের ধারণা হওয়ার সাথে সাথেই কৃষ্ণ-বর্ণের ধ্যান আরম্ভ করিবে। এইরূপ কিছুকাল করিতে করিতে যখন মনে একটু স্থিরতা আসিবে, তখনই নামজপে লাগিয়া যাইবে। যাহাদের ইষ্টমন্ত্র ওঙ্কার, তাহারা শুভ্রবর্ণের চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে থাকিবে, যেন শুভ্রালোকরূপী প্রণবের রূপ নিখিল ভুবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং কৃষ্ণবর্ণের চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে থাকিবে যেন সেই বিশাল বিপুল শ্বেতবর্ণ মন্ত্র ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া একেবারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ ধারণ করতঃ নিজের ভিতরে নিজে লুকাইয়া গেলেন, ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একমাত্র সূচীভেদ্য অন্ধকারই বিরাজিত রহিল। পর্য্যায়ক্রমে এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে মন কতক স্থির

* স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রক্রিয়া ইহার বিপরীত। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য দ্রষ্টব্য।

হইয়া আসিলে ভ্রূমধ্যে জলদগ্নি-সমপ্রভ ওঙ্কার ধ্যান করিতে করিতে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপিতে থাকিবে।

(২) চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে লক্ষ্য করিবে, চক্রবিঘূর্ণনের শব্দমধ্যে কোনও সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে কি না। কিছুকাল চেষ্টার পরে যখন তাহা শুনা যাইবে, তখন ঐ ধ্বনিকে **প্রণব (ওঁ) কল্পনা করিয়া** তাহা জপ করিতে থাকিবে। চরকা ব্যতীত তক্‌লী (টাকুয়া) কাটিবার সময়েও এইরূপ ওঙ্কার-জপে মন সহজে স্থির হয়। তক্‌লি ঘুরাইবার সময় প্রত্যেক বার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী-সঞ্চালনের কালে একবার করিয়া ওঙ্কার জপ করিবে এবং সেই ওঙ্কার-ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল ধ্বনিকে ছাপাইয়া অদ্বিতীয় সত্তায় বিরাজমান হইতেছে, এইরূপ কল্পনা করিতে থাকিবে।

চরকা-কাটা ও মনঃসংযম

(৩) পথ চলিবার কালে সর্ব্বদা সমান তালে পদক্ষেপ করিবে যেমন সৈনিকেরা করে এবং **প্রত্যেকটী পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ওঙ্কার জপ করিবে** এবং ভাবিতে থাকিবে যেন, প্রতিবার ওঙ্কার-স্মরণের সঙ্গে তোমার দেহে মনে অপূর্ব্ব দৈব-শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে।

শব্দমাত্রেই ওঙ্কার-ধ্যান করিতে হইবে। গোলন্দাজ বন্দুকের গুলির শব্দকে ওঙ্কাররূপে ধ্যান করুক। লাঠিয়াল লাঠি ঘুরাইবার বন্ বন্ শব্দকে ওঁ ওঁ বলিয়া অনুভব করুক। তীরন্দাজ তীরের শন্ শন্ শব্দে ওঙ্কার শ্রবণ করুক। অশ্বারোহী অশ্বের খুর-ধ্বনিকে ওঙ্কার কল্পনা করুক। রণক্ষেত্রে কামানের গর্জ্জনও ব্রহ্মচর্য্যানুরাগীর নিকটে

ধ্বনিমাত্রকেই প্রণব-চিন্তনের দ্বারা মনঃস্থৈর্য্য

ওঙ্কার-ধ্বনি বলিয়া গৃহীত হউক। গীর্জ্জার বা মন্দিরের ঘন্টা, স্কুলের বা রেল-ষ্টেশনের বেল, ভ্রমর-গুঞ্জন, গরুর গাড়ীর বা তেলের ঘানির কচ্ কচ্ শব্দ, মটর-কারের হর্ণ প্রভৃতিকেও ওঙ্কাররূপে কল্পনা করিয়া অবিরত নামের ধ্যান জমাইতে থাক। প্রভাত-পাখীর মধুর কাকলিতে, মধ্যাহ্ন-বায়সের কা-কা কলরবে, সান্ধ্য-সমীরণের সুমৃদুল নিঃস্বনে, বাসন্তী কোকিলার আকুল কুহরণে, শারদীয়া পাপিয়ার উচ্ছ্বসিত আহ্বানে, ঝঞ্ঝাময়ী বাত্যার আক্রুষ্ট গর্জ্জনে, ক্রুদ্ধ সমুদ্রের তরঙ্গাকুল তর্জ্জনে একমাত্র ওঙ্কারের দিব্য অনুভূতিকেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা কর। ইহাই হইল মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদনের এক অতি নিগূঢ় কৌশল। একাধিক ব্যক্তি একত্র ভ্রমণ করিতে থাকিলে তখন যদি সকলের পদক্ষেপ সমান তালে চলে,—তাহা হইলে তৎকালে প্রত্যেকটী পদক্ষেপ-ধ্বনিতে এইভাবে ওঙ্কার-স্মরণের দ্বারা মনঃসংযম ত' লাভ হইবেই, পরন্তু একত্র-ভ্রমণকারীদের চরিত্রের বিভিন্নতার আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া কতকটা এক-প্রকৃতিকতাও লাভ হইতে থাকে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য লইয়া পথ চলিবার কালে বৃথা কলরব-বর্জ্জন এবং যথাসাধ্য বাচিক সংযম অবলম্বন না করিলে কোনও সুফল পাওয়া নিশ্চিতই সুদূরপরাহত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪) নদীর ঢেউ চলিয়াছে; একটীকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া তাহার গতিকে দৃষ্টির দ্বারা অনুসরণ করিতে থাক। ঢেউটী যখন নিম্নগামী হয়, তখন একবার ওঙ্কার এবং যখন ঊর্দ্ধমুখ হয়, তখন একবার ওঙ্কার জপিতে থাক। ওঙ্কারই যাহাদের ইষ্টমন্ত্র, তাহারা নিজেকে ওঙ্কারের সহিত অভেদ জ্ঞান করিবে এবং ঢেউকে ওঙ্কারের সহিত অভেদ জ্ঞান করিবে। তৎপরে ঢেউটীর নিম্নগমনকালে

নিজেকে তাহার সহিতই নিম্নগামী বলিয়া এবং ঢেউটীর ঊর্দ্ধগমনকালে নিজেকে তাহারই সহিত ঊর্দ্ধগামী বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। এই ঊর্দ্ধ-অধঃ আন্দোলনের সহিত ওঙ্কারকে অবিরাম ছন্দোবদ্ধভাবে সংলগ্নিত রাখিবার প্রয়াস হইতে যাই মনের স্থিরতা আসিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ ভ্রূমধ্যে জ্বলদগ্নিসমপ্রভ ওঙ্কারের ধ্যান করতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-জপে লাগিয়া যাইবে।

সর্ব্ববিধ চিন্তা বর্জ্জনের দ্বারা মনঃসংযম

(৫) মনের মধ্যে একটী চিন্তা জাগিয়াছে, মনে কর স্কুলের কথাই জাগিয়াছে। আর কথা নাই, অমনি তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ হয়ত নূতন কথা মনে পড়িল। ধর, তোমার বাড়ির কথা। ঠিক তন্মুহূর্ত্তে সেই চিন্তাটীকেও ঝাটাইয়া বিদায় করিবে। আবার হয়ত জাগিল খেলার কথা। আর অবসর দিবে না, অবিলম্বে তাহাকেও অর্দ্ধচন্দ্রে দূরে সরাইবে। আবার হয়ত আসিল বন্ধুবান্ধবদের চিন্তা। ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই চিন্তাটীর মস্তকে লগুড়াঘাত করিবে। এইরূপে যেই চিন্তাই জাগুক না কেন, তাহাকেই তাড়াইতে তাড়াইতে অবশেষে মনের স্থৈর্য্য লাভ হইবে এবং এই স্থৈর্য্য আসিবা-মাত্র অগাধ আত্মপ্রত্যয় সহকারে নামজপে আত্মনিয়োগ করিবে।

ইচ্ছামত অসংলগ্ন চিন্তা দ্বারা মনঃসংযম

(৬) পূর্ব্বোক্ত উপায়টি কঠিন বলিয়া বোধ হইলে, নিম্নলিখিত উপায়টী আগে ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়া লইবে। যথা,—ইচ্ছাপূর্ব্বক অসংলগ্ন চিন্তা। এমনভাবে চিন্তা আরম্ভ করিবে যেন, তোমার চিন্তিত বিষয়-সমূহের প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয়টীর এবং দ্বিতীয়টীর সহিত তৃতীয়টীর সম্পর্ক থাকে কিন্তু প্রথমটীর সহিত তৃতীয়টীর এবং

দ্বিতীয়টীর সহিত চতুর্থটীর সংশ্রব মাত্রও না থাকে। যেমন যাদুঘর, প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি, কপিলাবস্তু, হিমালয়, আন্দিজ পর্ব্বত-মালা, আমেরিকা, স্বাধীনতার সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ান, সান-ইয়াৎ-সেন, চীন সাম্রাজ্য, দিয়াশলাইয়ের কারখানা ইত্যাদি। অথবা যেমন, ঘড়ী, ঘড়ীর কাঁটা, শিমূল কাঁটা, শিমূল তূলা, বালিশ, কাঁথা, সূঁই, পেরেক, জুতা, জুতার চামড়া, ছাগল, ছাগলের দুগ্ধ, গোদুগ্ধ, গোমূত্র, প্লীহারোগ, কলেরা, কলেরার টীকা, হুকার টীকা, তামাক ইত্যাদি। এইরূপ অসংলগ্ন চিন্তা যত দ্রুত করিতে থাকিবে, ততই মনের পরিশ্রম সুকঠোর হইতে থাকিবে এবং ক্রমে তাহার স্থৈর্য্য জন্মিবে। স্থৈর্য্য জন্মিবামাত্র গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে ইষ্টনাম বা ওঙ্কার জপ করিতে আরম্ভ করিবে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক মনকে ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত করিয়া সংযম

(৭) স্থিরাসনে সরল মেরুদণ্ডে বসিয়া আছ, হঠাৎ মনটাকে মূলাধার (উপস্থ ও গুহ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত যোনিমণ্ডল) হইতে যোনিমুদ্রা-যোগে সঙ্কুচিত করিয়া এক ধাক্কা দিয়া ওঙ্কার-সহযোগে অনন্ত ঊর্দ্ধে প্রেরণ করিবে, আবার ওঙ্কার-সহযোগে নামাইব। পুনরায় এক ধাক্কা দিয়া ওঙ্কার-সহযোগে অনন্ত নিম্নে নিক্ষেপ করিবে, আবার ওঙ্কার সহযোগে মূলাধারে আনিবে। এই ভাবে বারংবার মনঃসঞ্চালন করিতে থাকিলে মন আপনি স্থির হইবে। পরিশ্রমকে এজগতে কে না ডরায়?

(৮) মন স্থির করিবার আর এক উপায় হইতেছে, প্রত্যেক পাঁচটী স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণ ও পাঁচটী স্বাভাবিক প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

পরবর্ত্তী একটী শ্বাস ও প্রশ্বাসকে স্বাভাবিক শ্বাস ও প্রশ্বাসের চতুর্গুণ সময় লইয়া টানা। কিন্তু এইটির অভ্যাস যখন তখন না করিয়া প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিলেই অধিক ফল হইবে। এই সময়ে প্রত্যেকটী স্বাভাবিক বা বিলম্বিত শ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত একবার করিয়া প্রণব জপিবে।

শ্বাস প্রশ্বাসের ইচ্ছাকৃত গতি-বিচ্ছেদের দ্বারা মনঃসংযম

(৯) আর একটী সুন্দর উপায় হইতেছে, পনের বিশবার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া অতি অল্প কিছুক্ষণের জন্য গৃহীত শ্বাস আর পরিত্যাগ না করা এবং পুনরায় পনের বিশ বার শ্বাস-প্রশ্বাসের পরে অতি অল্প কিছুক্ষণের জন্য পরিত্যক্ত প্রশ্বাস গ্রহণ না করা। শ্বাস ও প্রশ্বাসের এই বিরতির সময়ে গুচ্ছে গুচ্ছে প্রণব জপ করিতে হয়, অর্থাৎ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ………এইভাবে ইষ্ট স্মরণ করিতে হয়। কিন্তু ইহা প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া করিবে, সর্ব্বক্ষণ করিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

(যাহারা সহজায়াম প্রণালীতে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-জপের উপদেশ গুরুমুখে অবগত, তাহাদের পক্ষে ৮ম ও ৯ম উপায়দ্বয় অবলম্বন নিষ্প্রয়োজনীয়)।

(১০) কিছুদিন অভ্যাসের দ্বারা মানুষ এমন কল্পনা-কুশলতা লাভ করিতে পারে যে, একটী মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা মহাভারতের সমগ্র কথা ভাবিতে পারে। সুতরাং কিছুদিন অভ্যাসের দ্বারা এমন নিপুণতা প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক যে, একটী স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণকালে

ধ্যানময় অজপা-সাধনের দ্বারা মনঃসংযম

যতটুকু সময় ব্যয়িত হয়, তাহারই মধ্যে নিজের জন্ম-কালীন সূতিকাগৃহ, মাতার ক্রোড়স্থ সদ্যঃ-প্রসূত নিজ মূর্ত্তি, ধাত্রীর কর্ম্মব্যস্ততা, পরিজনের আনন্দ ও আত্মীয়ের উলুধ্বনি, সবই সে চিন্তা করিতে পারে। আবার একটী স্বাভাবিক প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহারই মধ্যে নিজের মৃত্যুকালীন অবস্থা, আত্মীয়-পরিজনের শোকার্ত্ততা, শ্মশান-বন্ধুদের তৎপরতা, অন্তিম হরি-হরি-ধ্বনি, শ্মশান চুল্লীর জলন্ত অগ্নি ও দাহ্যমান শরীরের ভস্মে পরিণতি, এসবও ভাবা যায়। মনঃসংযমের পক্ষে এইরূপ অভ্যাস অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। "অজপা-সাধন" বলিয়া একটা বহুখ্যাত সাধন-পন্থার কথা অনেকেই অহরহ শ্রবণ করিয়া থাকেন। তাহার নিগূঢ় রহস্য গুরুবক্ত্র ব্যতীত প্রচারিতব্য নহে বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ শাসন রহিয়াছে। এইস্থলে আমি তাহারই মর্ম্ম সুকৌশলে প্রকটিত করিয়া দিলাম। ধীমান্ পুরুষই ইহা সুগভীর ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিবেন।

রসময় অজপা-সাধন দ্বারা মনঃসংযম

(১১) **প্রত্যেকটী শ্বাসসহ সদ্গুরু শ্রীভগবান্** আমার প্রাণাধিক প্রিয়রূপে আমার নিখিল ইন্দ্রিয়গ্রামের পরমা তৃপ্তি দান করিয়া **আমার সহিত মিলিত হন, প্রত্যেকটী প্রশ্বাস সহ আমি** আমার পরমপ্রিয়ের নিকটে গিয়া অনুরাগিণী অভিসারিকার ন্যায় আমার সর্ব্বস্ব **তাঁর পদতলে লুটাইয়া দিয়া মিলিত হই,** প্রতি শ্বাসে প্রতি প্রশ্বাসে তিনি আমার হন, আমি তাঁর হই; শ্বাসটী হইতেছে আমার সহিত তাঁহার মিলনের মন্ত্র,

প্রশ্বাসটী হইতেছে তাঁহার সহিত আমার মিলনের মন্ত্র,—এইরূপ অভিনিবেশের দ্বারাও মনঃস্থৈর্য্য লাভ হয়।

শ্রুতি-প্রত্যাহার ও মনঃসংযম

(১২) কোনও একটা কথা বা গান শুনিতেছ, সহসা কর্ণকে দূরবর্ত্তী অন্য এক বিষয়ে নিবিষ্ট কর যেন নিকটের শব্দও শুনিতে না পাও। দুই তিনটী লোক হয়ত একযোগে কথা কহিতেছে বা গান গাহিতেছে, চেষ্টা করিতে থাক যেন তাহাদের মধ্যে একজনের ব্যতীত অপর কাহারও কণ্ঠ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপ শ্রুতি-সংযমের দ্বারাও মনঃস্থৈর্য্য লাভ হয়।

সর্ব্ববস্তুতে ওঙ্কার-দর্শন ও মনঃসংযম

(১৩) **যখন যেই বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে, সেই বস্তুর মধ্যেই ওঙ্কার-দর্শনের চেষ্টা করিবে।** বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, অমনি কল্পনা করিতে আরম্ভ কর, যেন বৃক্ষটী জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কারের দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মাতৃমূর্ত্তি, পিতৃমূর্ত্তি, দেবমূর্ত্তি, গুরুমূর্ত্তি প্রভৃতি যাহারই কথা যখন মনে হইতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কল্পনার বলে ওঙ্কারের দ্বারা পরিবেষ্টিত কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দয়া, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি ভালমন্দ যে-কোনও প্রকার হৃদয়-বৃত্তির উত্তেজক বস্তুই চক্ষে পড়ুক বা মনে জাগুক, অমনি তাহাকে ত্বরিত কল্পনা-কুশলতা সহকারে ওঙ্কারের দ্বারা ঘিরিয়া ফেল। স্ত্রী, পুরুষ বা পশু-পক্ষ্যাদির জননেন্দ্রিয়ের জঘন্য মূর্ত্তি যদি কখনো তোমার মনে জাগরিত হয়, স্বকীয় বা পরকীয় ভোগেন্দ্রিয়ের ছবি যদি চিত্রপটে অঙ্কিত হইবার দাবী করিয়া বসে, প্রত্যাহার

চেষ্টা দ্বারা মনকে যদি সেই কদর্য্য দৃশ্য হইতে বিরত করিতে সমর্থ না হও, তবে সেই ঘৃণনীয় দৃশ্যের মধ্যে জলদগ্নিসমপ্রভ দীপ্যমান ওঙ্কারের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিত নিখিল-কলুষহারী মঙ্গলময় উপস্থিতির ধ্যান অভ্যাসবলে জমাইতে থাক। এইরূপ ওঙ্কারচিন্তন কামের বস্তুতে নিষ্কামতা, লোভের বস্তুতে নির্লোভতা, ভয়ের বস্তুতে ভয়হীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কোমল হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও শুদ্ধীকৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনঃশক্তি বৃদ্ধি করিবে।

(১৪) সর্ব্বশেষে এক অদ্ভুত এবং এতদিন ধরিয়া সযত্নে সঙ্গোপিত এক মনঃশাসনের কৌশল তোমাকে বলিতেছি। এমন অনেক কথাই এই পুস্তকে আমি বলিয়াছি, যাহা গুরুর পায়ে সাত বৎসর তেল মাখিবার আগে কোনও গুরু কখনও প্রকাশ করিয়া শিষ্যের নিকটে ধরেন নাই। তেমনই একটী অসাধারণ কৌশল বলিতেছি। ওঙ্কার ধ্যান করিতে থাক। জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কারকে ভাবিতে ভাবিতে যখন দেখিবে নাম স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন ভাবিতে থাক যে একে একে ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইয়া নিজেকে তাঁহার ভিতরে অস্তিত্বহীন করিয়া ডুবাইয়া দিতেছে। এইভাবে ভাবিতে ভাবিতে যখন মনে হইবে যে, সকল বস্তুই ডুবিয়া গিয়াছে, কিছুই আর ইহার বাহিরে নাই, তখন আবার ভাবিতে থাকিবে যে, ইহার ভিতর হইতেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তেত্রিশ কোটি দেবতা, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর আদি করিয়া মানব-অমানব যোনিরা, গ্রহ-নক্ষত্রেরা, কোটি কোটি সৌরজগৎ এবং জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা, সকল পথের সাধক-সাধিকারা, পশুপক্ষি-সরীসৃপ বৃক্ষ-

গুল্মাদি সবই বাহির হইতেছে এবং নিখিল সৃষ্টি অভিনব প্রাণস্পন্দনে পরিপূরিত হইয়া যাইতেছে। এইভাবে একবার সমগ্র প্রকাশিত সৃষ্টির ওঙ্কারে নিমজ্জমান হওয়া এবং আবার ইহা হইতেই বিকশিত ও বিসর্পিত হওয়ার বিষয় অবিরাম অতি দ্রুত গতিতে ধ্যান করিতে করিতে এক আশ্চর্য্য রকম মনঃসংযম-সামর্থ্য তোমার উপজাত হইবে।

মনঃস্থৈর্য্য-সম্পাদনের জন্য এইরূপ শত সহস্র উপায়ের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে অনেকগুলি বিপজ্জনকও হইতে পারে। কিন্তু **এই গ্রন্থে এমন একটী কথাও উপদিষ্ট হয় নাই, যাহার দ্বারা কেহ কখনও কোনও প্রকারে বিপন্ন হইতে পারে।** পাণ্ডিত্য ফলাইবার জন্য এইগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই, তোমাদের জীবন-গঠনে সহায়তা প্রদানই একমাত্র উদ্দেশ্য। এমন একটী বিষয়েরও অবতারণা এই গ্রন্থে করা হয় নাই, যাহার ভালমন্দ সকল ফলাফল গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত, অনুশীলিত ও আস্বাদিত হয় নাই এবং যাহার অব্যর্থতা, নিরাপত্তা ও উপযোগিতা বহুসহস্র সংযমেচ্ছু কিশোর-কিশোরীর জীবনগঠন-প্রয়াসের ভিতর দিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় নাই। পুস্তকখানা পড়িয়াই ক্ষান্ত না দিয়া একটী একটী করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি অভ্যাসে আনয়ন করিতে যত্নবান্ হইও। যাহা অভ্যাসে শত শত হতভাগ্য ধ্বংসোন্মুখ যুবক জীবনকে সংগঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা তোমাকেও অবশ্যই কল্যাণ প্রদান করিবে। সুতরাং **আশ্বস্ত হও এবং অধ্যবসায়ী হও।** পুস্তক হয়ত কতই পড়িয়াছ, কিন্তু অভ্যাস ব্যতীত ত' কল্যাণকে করায়ত্ত করিতে পারিবে না। অভ্যাসের অমৃতময় ফলেই তোমার জীবন সুগঠিত হইবে, সুন্দর হইবে, সুপবিত্র হইবে। ভারতবর্ষের

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ আজ তোমাদের নিকটে মনুষ্যত্বদীপ্ত উন্নত জীবনের দাবী করিতেছে, তাই নবজাগরণের মহামন্ত্র আজ দিকে বিদিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, মহাযজ্ঞের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছে আর মহা-শিবিরে ভৈরব বিষাণ ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া গর্জ্জন করিতেছে। এমন দিনে তোমরা আলস্যে আলস্যে গল্প করিয়াই কাল কাটাইবে? এমন-দিনে তোমরা কি শুধু বই পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হইবে? তোমাদের মধ্যে যে মানুষ হইবার যোগ্যতা আছে, একথা কি তোমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত করিবে না? তোমরা কি মানুষ হইবে না? অধঃপতিত, সর্ব্বস্বান্ত, পরপদবিদলিত ভারতবর্ষে আজ যে সর্ব্বাগ্রে চাই মানুষ, আজ যে সর্ব্বাগ্রে চাই তেজোদীপ্ত, অসমসাহসী, দৈববলে বলীয়ান্, অসাধ্য-সাধনক্ষম, বলবান্ বীরের আত্মোৎসর্গ।

ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার নিকটে কি দাবী করিতেছে?

আমি তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥
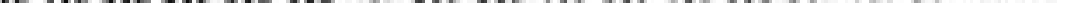
বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দলে যার সকল স্বার্থ,
দীন দুখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই।"

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব-ঠাঁই।

তাদেরি লাগিয়া পিপাসী নয়ন
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥ *

দেশ দাদ্‌রা।

— — — —

"বীর্য্যের সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা"

— শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ —

created by Mukherjee TK,Dhanbad

যৌগিক আসন-মুদ্রা

যৌবনের স্বচ্ছন্দচারী বিলাস-চপল মদমত্ত মন যাহাদের জীবনকে স্খলিতাদর্শ করিতে পারে না, এ জগতে তাহাদের অসাধ্য কি? আপাত মধুর কিন্তু পরিণামতিক্ত, মুখরোচক কিন্তু উদর-সন্তাপক, ক্ষণ-মনোহর কিন্তু চির দুঃখদ কামমোহে যাহারা অভিভূত হয় না, তাহাদের মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? বর্ষাকালের নদীর জলের ন্যায় যৌবনের বুদ্ধিবৃত্তি কিছুটা আকুল, আবিল ও দূষিত হয়ই কিন্তু যে ব্যক্তি সদুপদেশের ও সৎসঙ্গের অঙ্গারে ছাকিয়া বিবেকরূপ ফিটকিরি দিয়া জল পরিষ্কার করিয়া পান করেন, তিনিই চতুর। একবার যদি যৌবনের লোলকটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া যাইতে পার, একবার যদি এই দুঃসময়টা প্রাণে মনে ভগবানের নাম করিতে করিতে কোনও ক্রমে কাটাইয়া দিতে পার, তবেই বাঁচিলে! যে যৌবন যথার্থ যৌবন, অশীতি বর্ষ বয়সেও যাহা জরাজীর্ণ হয় না, সেই শান্ত সংযত মহদাদর্শের চরণে সমর্পিত, নিত্য প্রবুদ্ধ মহাযৌবন তাহা হইলেই লাভ হইল।

কিন্তু এজন্য তোমার তপস্যা ও অধ্যবসায় চাই। বিনা পরিশ্রমে কেহ পারিশ্রমিক পায় না, বিনা যত্নে রত্ন মিলে না। মনকে সংযত ও শাসিত রাখিবার জন্য তোমাকে যেমন একদিকে প্রচণ্ড প্রয়াস পাইতে হইবে, তেমনি আবার দেহটীকেও অনুকূল ভাবে গঠন করিবার যত্নে ত্রুটি থাকিলে চলিবে না। **দরিদ্রের যেমন ক্ষুধা বেশী, দুর্ব্বলের তেমন কাম বেশী।** ঋণ-প্রার্থিগণ যেমন মহাজনের পিছনে পিছনে ঘোরে, কাম এবং রোগ, দুঃখ, মনঃপীড়া, হতাশা, অবসাদ প্রভৃতি

কামের পরমপ্রিয় অনুচরেরাও তেমন দুর্ব্বলের পদানুসরণ করে। সুতরাং যে প্রকারেই হউক, তোমাকে সবল ও শক্তিমান্ হইতেই হইবে।

সর্ব্বপ্রকার বিদেশী ও দেশী কসরৎ দেহ-গঠনের পক্ষে হিতজনক। সুতরাং সুযোগ, সুবিধা ও রুচি অনুযায়ী যে-কোনও প্রকার ব্যায়ামই হউক, নিষ্ঠার সহিত করিবে। **নিয়মিত ভাবে না করিলে এবং ফলাফলের জন্য সহিষ্ণুতার সহিত উপযুক্ত কাল অপেক্ষা না করিলে এ জগতে কোনও কার্য্যই যে সুসিদ্ধ হয় না,** এই কথা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিয়া দেহ-গঠনে প্রবৃত্ত হইবে।

ব্যায়ামের অতিরিক্ত যোগশাস্ত্রোক্ত যোগিজন-মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি আসন-মুদ্রা প্রভৃতিও অভ্যাস করিবে। শুধু ব্যায়ামের দ্বারা যাহা হয় না, এমন অনেক উপকার আসন-মুদ্রা দ্বারা সাধিত হয়। ব্যায়ামে শরীরের মাংসপেশীর পরিপুষ্টি ও দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, কিন্তু যোগীরা এমন ভাবেই আসন ও মুদ্রাগুলির পরিকল্পনা করিয়াছেন যে, অনেক সময় মাংসপেশীর উপরে ইহাদের কোনও ক্রিয়াই লক্ষিত হয় না, পরন্তু দেহের প্রধান প্রধান স্নায়ুগুলি সক্ষম, সুদৃঢ় ও সুগঠিত হয়। এই জন্যই বহুভোজী একজন ব্যায়ামবীর অপেক্ষা অল্পভোজী একজন হঠযোগীর দেহে বল বেশী থাকে। আমি অবশ্য তোমাদিগকে আকাশ-সঞ্চরণক্ষম অথবা বিনা নৌকায় নদী উত্তরণে সমর্থ দেখিলেই খুশী হইয়া যাইব না। আমি চাহি যে, বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় অসুযোগ ও অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও তোমরা নিজ নিজ দেহকে আত্মার্থে প্রস্তুত কর এবং ইহাকে উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করিয়া কৃত-কৃতার্থ হও। অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিলেই মানুষের জীবন সার্থক

হইল, তাহা নহে। লৌকিক ব্যবহারের মধ্য দিয়াই জীবনকে চরম চরিতার্থতার পথে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে,—ইহাই আজিকার যুগের বাণী। তাই, এখানে এমন কয়েকটী আসন ও মুদ্রার কথাই লিখিব, যাহা বীর্য্যধারণের ক্ষমতাকে বর্দ্ধিত করিবে, অপিচ যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে বা গৌণতঃ কোনও ক্ষতির কারণ হইবে না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রায় সকল আসন ও মুদ্রাই প্রাতে ও সন্ধ্যায় অভ্যাস করা উচিত। স্বল্প মহামুদ্রা এবং অশ্বিনী, যোনি, সঙ্কিনী প্রভৃতি গুহ্য-দেশ ও উপস্থ সম্পর্কিত মুদ্রাগুলিই কেবল রাত্রে ও শয়নের পূর্ব্বে পুনরায় অভ্যাস হিতকর এবং আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিতে পৃথক্ ও পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হওয়াই প্রচলিত রীতি। কিন্তু প্রয়োজনস্থলে অভ্যাসার্থীরা পরিষ্কৃত পবিত্র শয্যাও ব্যবহার করিতে পারেন।

মুক্তপদ্মাসন :— বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিয়া তাহার উপর দুই হাতের তালু রাখিলে মুক্তপদ্মাসন হয়। অথবা দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ এবং বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ রাখিয়া তাহার উপরে দুই হাতের তালু রাখিলেও মুক্তপদ্মাসন হয়।

উপাসনার স্তোত্রাদি পাঠকালে যে সকল সময়ে করদ্বয় যুক্ত বা মুক্ত থাকা স্বাভাবিক, সেই সময়ে করদ্বয়ের তালু হাঁটুতে রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

ইহাতে গৌণভাবে ইন্দ্রিয়-দমনের কিছু সাহায্য হয়। কিন্তু মুক্ত পদ্মাসনের দ্বারা বিশেষ উপকার এই সাধিত হয় যে, এই আসনে উপবেশন করিলে বিনা ক্লেশে মেরুদণ্ড সরল রাখা সম্ভব হয় এবং অশ্বিনীমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, সঙ্কিনীমুদ্রা, যোগিনীমুদ্রা প্রভৃতি গুহ্য

ও জননেন্দ্রিয়-সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়জয়-সহায়ক আশ্চর্য্য-ফলপ্রদ মুদ্রাগুলি এই আসনে বসিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে অভ্যাস করা সহজ হয়। অধিকন্তু, ইহা পদদ্বয়ের বাত-রোগে বিশেষ হিতকর, সন্দেহ নাই।

মেরুদণ্ড সরল করিয়া বসিবার পক্ষে অসাধারণ ভাবে সহায়ক বলিয়াই এই আসনটির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা। কিন্তু নিতম্বদেশে মাংসের ও পেশীর স্বল্পতাহেতু মুক্তপদ্মাসনে বসিয়াও যাহারা মেরুদণ্ড সরল রাখিতে পারে না, তাহারা পাছার নীচে অতি সামান্য উঁচু একটী কম্বলাংশ বা প্যাড ব্যবহার করিতে পার।

কিন্তু **বদ্ধপদ্মাসন** করিয়া বসিলে মেরুদণ্ডের সরলতা আরও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া এবং যোনিলিঙ্গের (প্রথম পরিচ্ছেদে ২৯ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তি হইতে ৩০ পৃষ্ঠার প্রথম ৫ পংক্তি দ্রষ্টব্য) চাপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়-দমনে বদ্ধপদ্মাসন একটু বেশী উপযোগী। মুক্ত-পদ্মাসনে বসিয়া দুই হাতের দ্বারা পৃষ্ঠের দিক হইতে বিপরীতক্রমে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বুকের উপর চিবুক রাখিয়া ভ্রূমধ্য দর্শন করিবে। ইহাকেই বদ্ধপদ্মাসন বলে। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিবার জন্য চক্ষুর পেশী ও তন্তুগুলিকে বিন্দুমাত্রও পীড়া দিবে না। মনকে ভ্রূমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলে ধীরে ধীরে কয়েকদিনের অভ্যাসের ফলে বিনা কষ্টেই দৃষ্টি স্বভাবতঃ অভিপ্রেত স্থানে যাইবে।

সুখ-গোমুখাসন :—হাঁটুর উপর হাঁটু রাখিয়া দেহের পশ্চাৎ পার্শ্বে বামভাগে দক্ষিণ গোড়ালি আর দক্ষিণ ভাগে বাম গোড়ালি রাখিয়া গোমুখাকারে বসিলেই সুখ-গোমুখাসন হইল।

সুখ-গোমুখাসনে বসিলে অণ্ডকোষাদি প্রচুর চাপে থাকে বলিয়া বীর্য্যস্খলনের সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং উপস্থ-মধ্যে দেহাভ্যন্তরস্থ রক্তস্রোত প্রবলবেগে ধাবিত হইতে পারে না বলিয়া উপস্থকে সহজে

উত্তেজিত করিতে পারে না। আর যদিও বা রক্তস্রোত জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও এই আসনের দ্বারা যোনিলিঙ্গদ্বয়ের চাপ হ্রাস পায় বলিয়া ঐ রক্তস্রোতের পুনরায় দেহাভ্যন্তরে চলিয়া যাওয়ার বাধা হয় না। এই আসন বারদীর সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রিয় ছিল।

যাহাদের অণ্ডকোষে কোনও স্ফীতি, বেদনা ও পীড়া আছে, তাহারা এই আসন করিবে না।

উত্তান গোমুখাসন :—উভয় পদের হাঁটুদ্বয়ের উপরে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ পায়ের গোড়ালি দক্ষিণ নিতম্বের এবং বাম পায়ের গোড়ালি বাম নিতম্বের নিকটে রাখিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে বাহিরের দিকে ছড়াইয়া উপবেশন করিলেই উত্তান গোমুখাসন হইল। এই আসন পায়ের শিরা-উপশিরার বল-বিধান করে এবং ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের সহায়তা করে।

কূর্ম্মাসন :—অণ্ডকোষের নীচে দুই গোড়ালি পরস্পর বিপরীত ভাবে রাখিয়া গলা, মাথা এবং দেহ সোজা করিয়া বসিলে কূর্ম্মাসন হয়। এই আসনে গৌণভাবে ইন্দ্রিয় দমনে সহায়তা হয়। এই আসন অভ্যাসের দ্বারা কটিদেশ ও জানুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের বাত-রোগ সত্বর নিরাময় হয়।

* * **সপ্রণতি কূর্ম্মাসন** :—কূর্ম্মাসনে বসিয়া ইহার সঙ্গে পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে নাসিকা-স্পর্শের চেষ্টা করিয়া শিবনেত্রে প্রণতি করিতে হয়। ইহা বীর্য্যধারণ-ক্ষমতা অপূর্ব্বভাবেই বর্দ্ধিত করে।—একান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি, ফুস্‌ফুসের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা অন্ত্রক্ষত-রোগী কখনও সপ্রণতি কূর্ম্মাসন অভ্যাস করিবে না।

"সপ্রণতি কূর্ম্মাসনে" মস্তক অবনত করিয়া প্রণতি করিবার কালে শ্বাস ত্যাগ করা এবং মেরুদণ্ড সরল করিয়া মস্তক উত্তোলন করিবার কালে প্রশ্বাস গ্রহণ করা বিধেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে বলপ্রয়োগ নিষেধ,—প্রায় স্বাভাবিকই থাকিবে।

পশ্চিমোত্তান আসন :—পদদ্বয় সংলগ্ন করিয়া সম্মুখের দিকে বিস্তারিত করিয়া দিয়া দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের দ্বারা এবং বাম পদের অঙ্গুষ্ঠা বাম হস্তদ্বারা সজোরে ধরিয়া মস্তিক আনত করিয়া মস্তক দ্বারা হাঁটু স্পর্শ করিবে। প্রথম অভ্যাসকারীর পক্ষে একেবারে হাঁটু স্পর্শ করা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া উপলব্ধ হইবে। এইরূপ স্থলে সহিয়া সহিয়া ক্রমশঃ অভ্যাস করা সঙ্গত। প্রথম প্রথম মস্তক যতটা আনত করা সম্ভব, ততটুকু করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অভ্যস্ত হইয়া গেলে বলবান্ ব্যক্তি প্রতি উপবেশনে পাঁচবার হইতে পঞ্চবিংশবার ইহা করিতে পারে। মস্তিষ্কের জড়তা, সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও অলসতা বিদূরণের ইহার ক্ষমতা অপরিমেয়। চিরকালের অলস ও কর্ম্মকুণ্ঠ ব্যক্তিদের যদি জোর করিয়া ধরিয়া ইহা পনের দিন বাধ্যকর ভাবে অভ্যাস করান যায়, তাহা হইলে আজন্ম-অনুশীলিত অলসতা দূর হইয়া যাইবে; শ্রমকাতর অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও কর্ম্মঠ ব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম সপ্রণতি কূর্ম্মাসনের স্থায়।

উগ্রাসন :—পদদ্বয় একটু ফাঁক করিয়া পশ্চিমোত্তান আসন করিয়া মস্তক দ্বারা মৃত্তিকা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে।

উগ্রাসন-সম্পর্কিত অপরাপর জ্ঞাতব্য পশ্চিমোত্তান আসনবৎ।

ইহাও তদ্রূপ উপকারী। কিন্তু কিঞ্চিৎ কঠিনতর। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম সপ্রণতি কূর্ম্মাসনের ন্যায়।

* * **অনুবজ্রাসন** :—উপবিষ্ট হইয়া পদদ্বয়কে সম্মুখ দিকে প্রসারিত কর। একটি গোড়ালি হইতে অপর গোড়ালি তোমার হাতের মাপে একহাত দূরে স্থাপিত কর। গোড়ালি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি যাহাতে ভূমিতল স্পর্শ করে, পদদ্বয় এইরূপ ভাবে স্থাপিত কর। হাঁটুর ঠিক নীচে হস্তদ্বয় সহজভাবে পায়ের উপরে রাখ। তৎপরে গোড়ালি না নাড়িয়া আস্তে আস্তে নাসিকা ও ললাটের দ্বারা ভূমিতল স্পর্শ কর বা করিতে চেষ্টা কর।

ইহা পায়ের বাতে বিশেষ উপকারী। উদরাময়েও হিতকর। প্রতি উপবেশনে পাঁচবার হইতে ত্রিশ বার পর্য্যন্ত ইহা অভ্যাস চলিতে পারে। ইহা উগ্রাসন হইতেও কঠিনতর। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম সপ্রণতি কূর্ম্মাসনের ন্যায়।

ভুজঙ্গাসন :—উপুড় হইয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ভূমিতে রাখিয়া দুই হাতের তালুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় উপর দিকে মাথা তুলিলে ভুজঙ্গাসন হয়। যোগীরা বলেন, এই আসনের অভ্যাসে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্রসন্না হন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আসন অভ্যাসে জনন-যন্ত্রের আভ্যন্তরাংশের এবং সন্নিকটবর্ত্তী অপরাপর কয়েকটী যন্ত্রের আংশিক দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই ইহা ইন্দ্রিয়-সংযমের শক্তি দান করে। নিম্নলিখিত ভুজঙ্গিনী-মুদ্রা অভ্যাসকারীর পক্ষে ভুজঙ্গাসন নিষ্প্রয়োজন।

ভুজঙ্গিনী-মুদ্রা :—**বুক-ডনের** এমন একটি **বিশেষ যৌগিক প্রক্রিয়া** আছে, যাহা অভ্যাস করিলে ভুজঙ্গাসন অপেক্ষা অধিক

উপকার হইবে। তাহার নাম ভুজঙ্গিনী-মুদ্রা। ইহা দৈনিক ৫টী হইতে ৫০টী পর্য্যন্ত করা চলে। সাধারণতঃ পালোয়ানগণ বুক-ডন করিতে যেমন করিয়া থাকেন, ইহাতেও তেমন ভাবেই মাটীর উপর হাতের তালু রাখিয়া উপুড় হইতে হয়। কিন্তু পদদ্বয় একত্র সংযুক্ত না করিয়া পরস্পর হইতে একহাত দূরে রাখিতে হয়। তৎপর ডন আরম্ভ করিবার সময়ে হাতের তালু দ্বারা সমগ্র শরীর-পিণ্ডটাকে এমন ভাবে পশ্চাৎ দিকে আস্তে আস্তে ঠেলিতে হয়, যেন পায়ের রগগুলিতে টান পড়ে। তৎপর হাত ভাঙ্গিয়া অন্যান্য বুক-ডনের ন্যায় ন্যায় মাটীতে পড়িতে হয়, কিন্তু উঠিবার কালে কোমরকে যথাসাধ্য ভাঙ্গিয়া সর্পের ন্যায় মাথা উপর দিকে তুলিয়া তারপরে উঠিতে হয়। ইন্দ্রিয়-সংযম-সাধনে সাধারণ বুক-ডনের চেয়ে ইহা পাঁচগুণ অধিক ফলপ্রদ।

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি বুক-ডন করিবার মত কুবুদ্ধি আর কিছু নাই। স্বভাবের উপর নির্ভর কর, দুই চারিদিন ডন করিতে করিতে আপনিই ঠিক পাইবে, কখন শ্বাস গ্রহণ, কখন ত্যাগ ও কখন রুদ্ধ রাখা বিধেয়। শরীর-পিণ্ডকে পিছন দিকে ঠেলিবার সময় শ্বাস গ্রহণ হয়, শরীরটাকে মাটীতে ফেলিবার সময়ে শ্বাস রুদ্ধ থাকে এবং কোমর ভাঙ্গিয়া উঠিবার সময়ে প্রশ্বাস পতিত হয়। ইহা বিনা চেষ্টায় স্বভাবতঃই হয়। শ্বাসে, প্রশ্বাসে ও কুম্ভকে একবার করিয়া ইষ্টনাম জপ কর্ত্তব্য।

ভুজঙ্গাসন অপেক্ষা আমরা এই ভুজঙ্গিনী-মুদ্রা বা যৌগিক প্রক্রিয়ার বুক-ডনটীকে অধিকতর নিরাপদ ও ফলোপধায়ক বলিয়া মনে

(১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
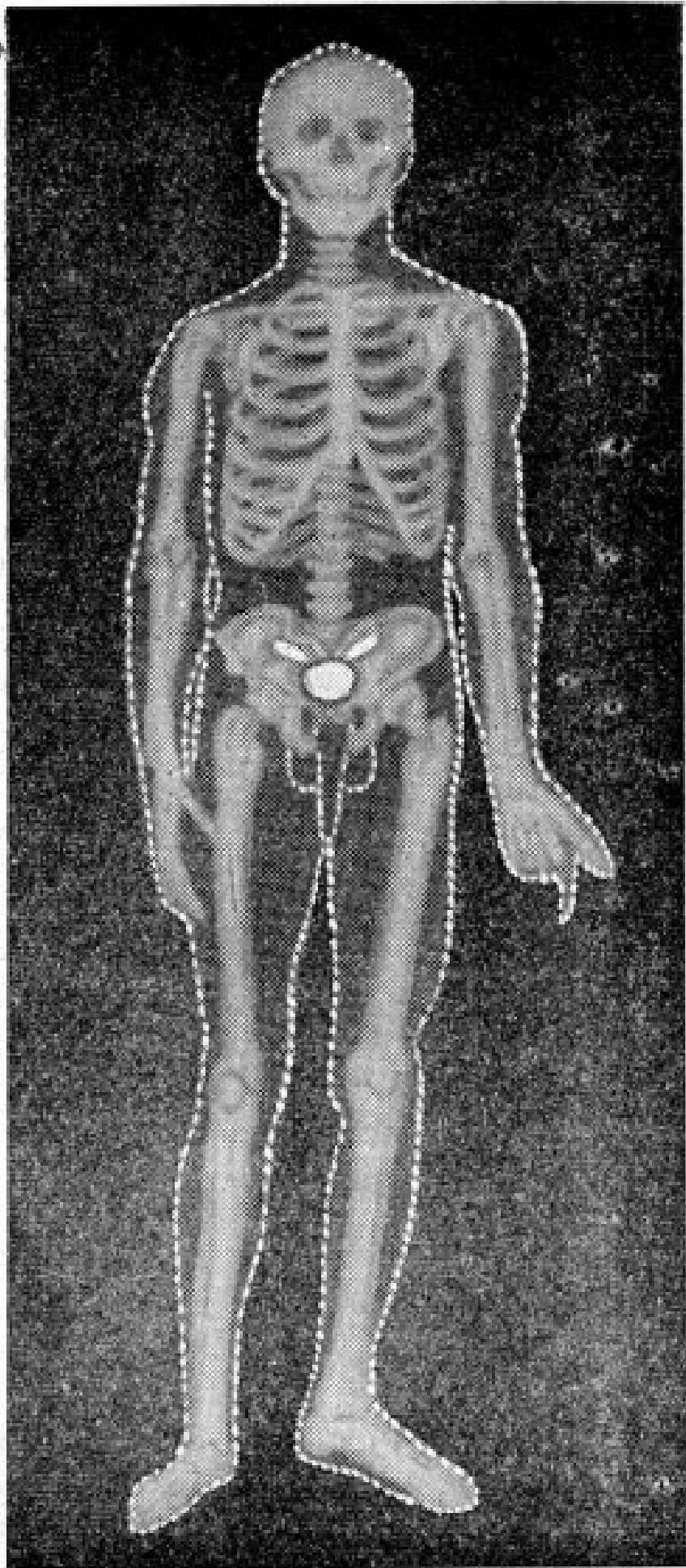
অযাচক আশ্রমীর (অখণ্ডের) জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণ (পুরুষ)

(৯৫ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি এবং ৯৬ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি দ্রষ্টব্য।)
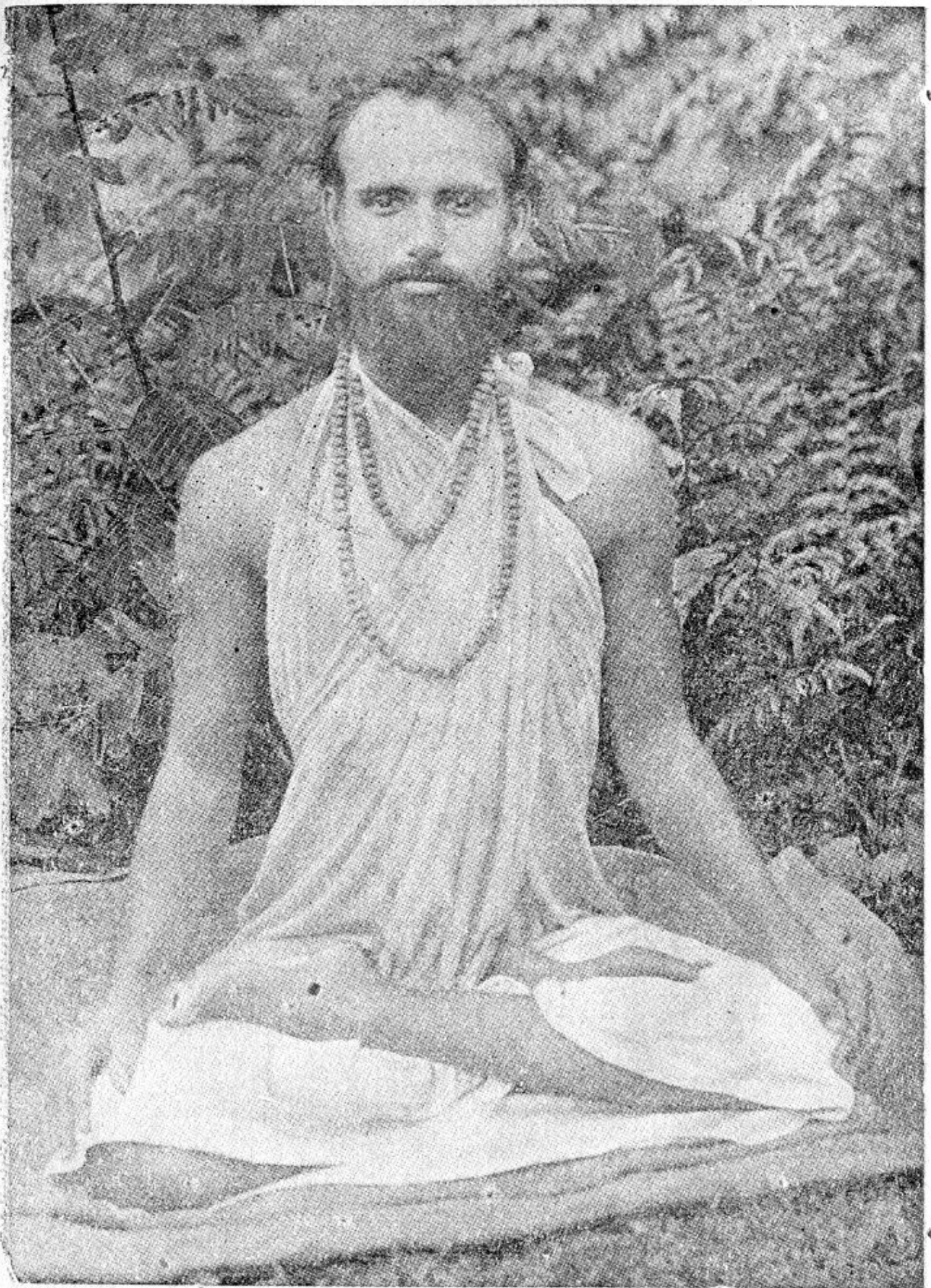
মুক্ত পদ্মাসন

(এই গ্রন্থে ১১২ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তি হইতে ১৭ পংক্তি দ্রষ্টব্য ।)
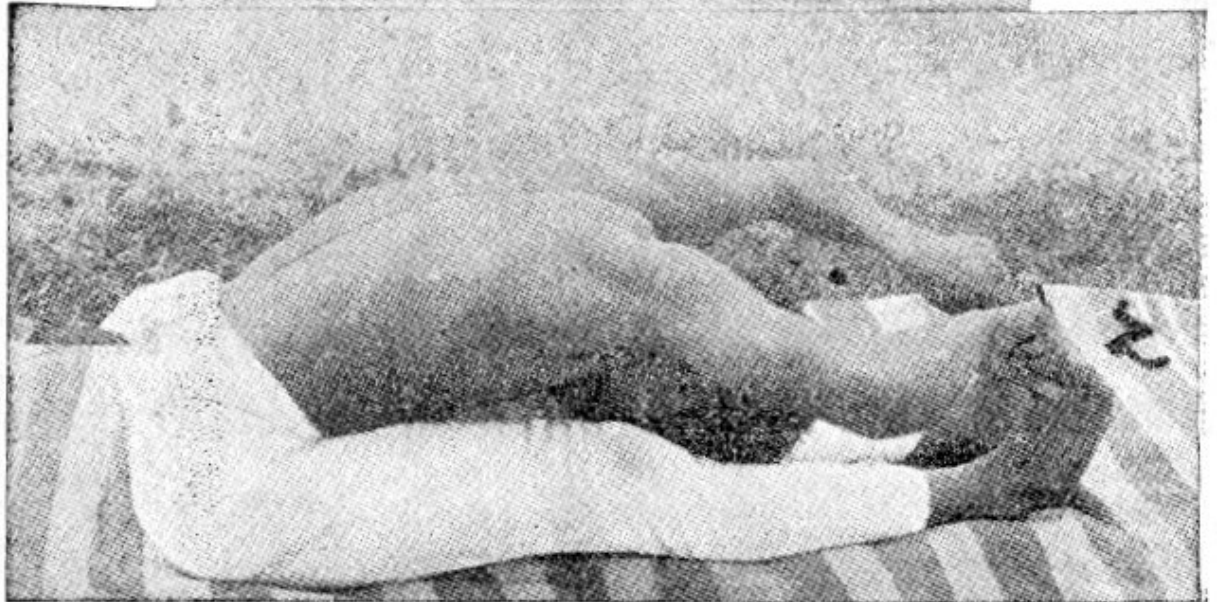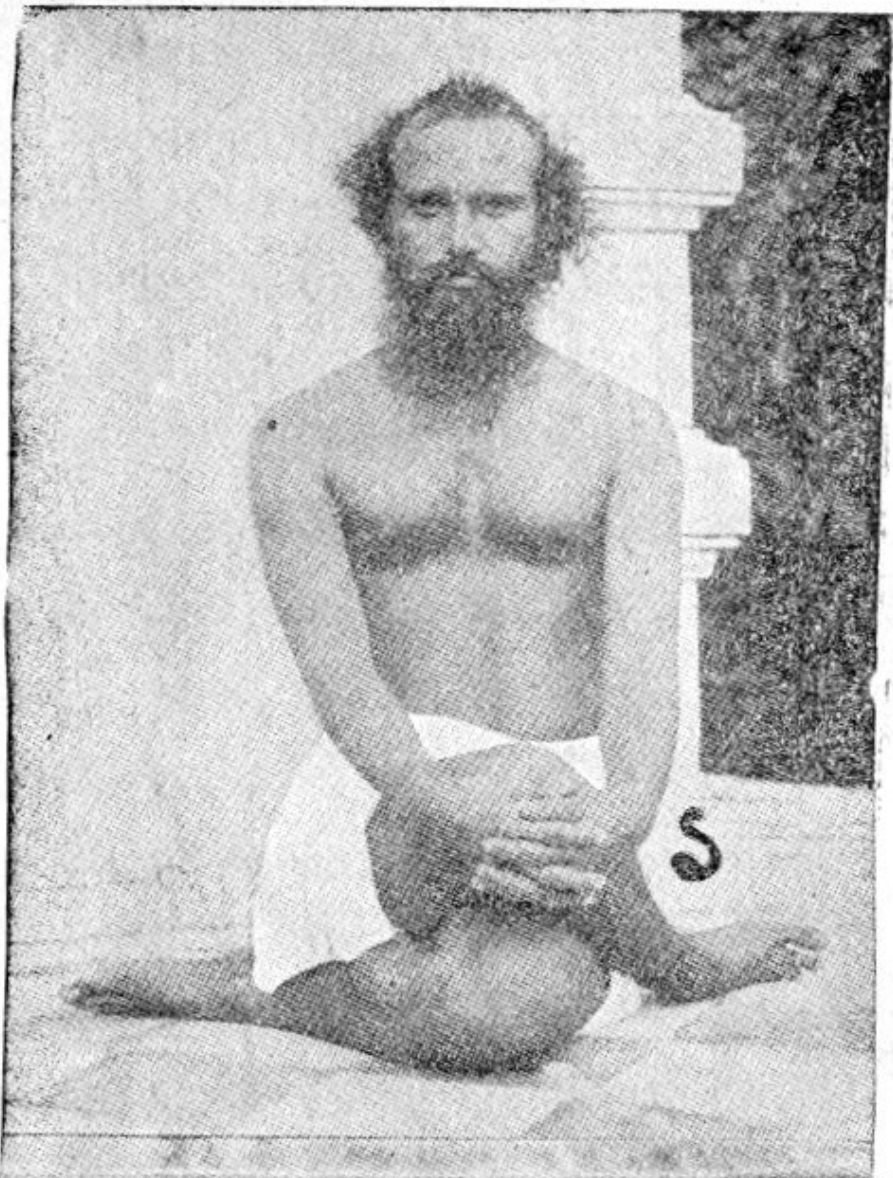
উপরে ঃ—**সুখ-গোমুখাসন** (১১৩ পৃষ্ঠার ১৮ হইতে ২০ পংক্তি দ্রষ্টব্য। (নীচে ঃ—**পশ্চিমোত্তানআসন** (১১৫ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি হইতে ১৯ পংক্তি দ্রষ্টব্য।)
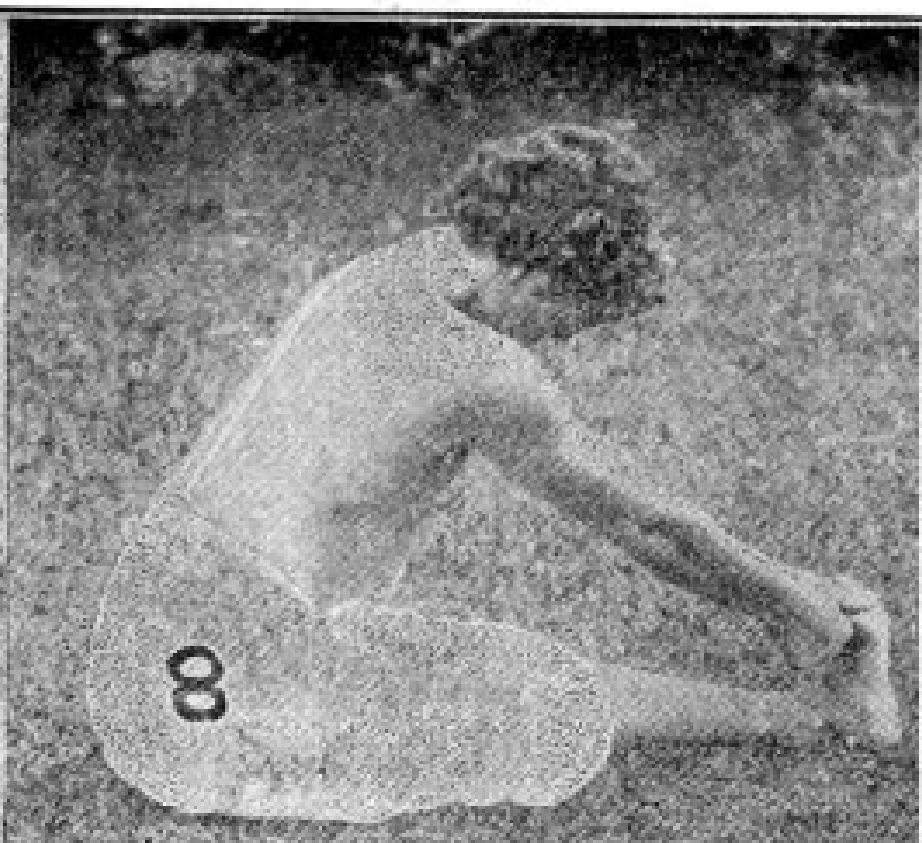
১নং লঘুমহামুদ্রা—আসনীয়া (সম্মুখের দৃশ্য) ২নং লঘুমহামুদ্রা—আসনীয়া (পশ্চাতের দৃশ্য)। ৩নং লঘুমহামুদ্রা উভয়া। ৪নং লঘুমহামুদ্রা—দক্ষিণা। লঘুমহামুদ্রা—বামা ঠিক দক্ষিণার বিপরীত।
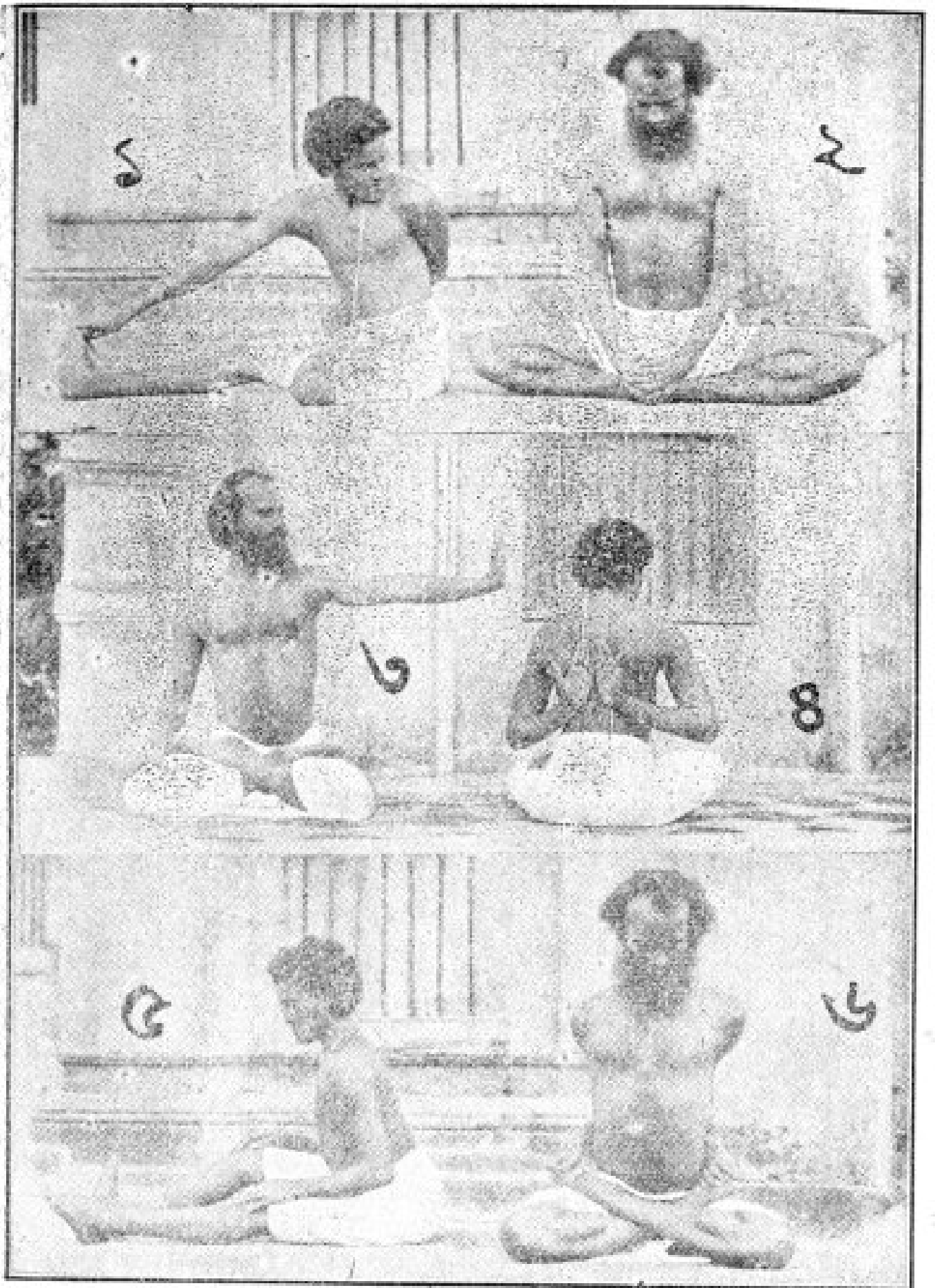
১। সপ্তাবর্ত্তনী মহামুদ্রা। কূর্ম্মাসন। ৩। অভয়া-মুদ্রা
৪। কাকী মুদ্রা। ৫। স্বল্পমহামুদ্রা। ৬। বদ্ধ পদ্মাসন।

করি। আসন বা মৃত্তিকার উপরে নাভি পর্য্যন্ত উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে হয় বলিয়া ভুজঙ্গাসনে জননাঙ্গের উপরে চাপ পড়ার এবং তজ্জনিত আকস্মিক অসুবিধার কারণ রহিয়াছে। সুতরাং ভুজঙ্গাসনের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীর পক্ষে এই বুক-ডনটাই বিশেষ যত্নসহকারে করা উচিত। কিন্তু যাহারা অগ্রসর, তাহারা ভুজঙ্গাসনে নির্ব্বিঘ্নে করিতে পারে, যেহেতু অগ্রসর সাধকের পক্ষে লৈঙ্গিক উত্তেজনার বা আকস্মিক অস্বস্তির সম্ভাবনা অতি অল্প।

* * **ভেকাসন** :—ভুজঙ্গাসনের সুফলই ভেকাসনে পাওয়া যায়। ইহা ভুজঙ্গাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু ভুজঙ্গিনী-মুদ্রা অপেক্ষা ন্যূনগুণ। যদিও ভেকাসন ভুজঙ্গিনী-মুদ্রার সমকক্ষ নয়,—তথাপি ইহা দ্বারা যথেষ্টই উপকার হয়। বুক-ডনের ভঙ্গীতে মাটীতে পড়িয়া এক পা দুই হস্তের মধ্যস্থলে আনিয়া অপর পা যতটা সম্ভব সরল রাখিয়া প্রাণপণ যত্নে নাভিটাকে মাটীর সহিত মিলাইবার চেষ্টা করিতে হয়। অবশ্য নাভিটাকে মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন করা সম্ভব নহে, কিন্তু চেষ্টা করিতে হয়। এক পায়ের কাজ হইয়া গেলে পুনরায় হস্তদ্বয়-মধ্যবর্ত্তী চরণকে পশ্চাতে সরলভাবে প্রসারিত করিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী চরণকে হস্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাখিতে হয়। ভুজঙ্গিনী-মুদ্রার ন্যায় ভেকাসনও ব্যায়াম করিবার সময়ে করণীয়। দৈনিক ১৫ বার হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত ভেকাসন করা যাইতে পারে। ইহা পায়ের বাতও নিবারণ করে।

ভেকাসনে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই। এই আসন দ্রুত অভ্যস্য। এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, ভেকাসন, ভুজঙ্গিনী-মুদ্রা প্রভৃতিকে আসন-শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন। কারণ, আসনের সংজ্ঞাই

হইতেছে,—"স্থিরসুখমাসনম্ ।" ইহাদিগকে মুদ্রাশ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করাই সঙ্গত।

আসন ও মুদ্রার দ্বারা বীর্য্যক্ষয়ের প্রবণতা কমে, কিন্তু যে বীর্য্য কুচিন্তা দ্বারা শুক্রকোষে আসিয়া জমিয়াছে, তাহার বহির্নির্গম ইহারা সম্পূর্ণ রোধ করিতে পারে না। সুতরাং বীর্য্যক্ষয়ের প্রকৃত প্রতীকার তোমার মনেরই মধ্যে। অণ্ডকোষের সাহায্যে রক্ত হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়া যে সকল শুক্রকণিকা প্রতিনিয়ত শুক্রকোষে আসিয়া জমিতেছে, তাহার সবটাই যে ক্ষয়িত হইবেই, তাহা নহে। শুক্রকোষ-মধ্যে শুক্র ব্যয়ার্থেই জমিতেছে সত্য, কিন্তু এই শুক্রকোষদ্বয়ের মধ্যে এমন এক ঐশ্বরিক বিধান বিরাজমান, যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শুক্র তাহারা সূক্ষ্মভাবে সমগ্র দেহমধ্যে পুনঃ প্রেরণ করিতে পারে। শরীরের গঠন ও বংশানুক্রম প্রভৃতি অনুসারে কাহারও এই পুনর্গ্রহণ-শক্তি অত্যধিক, কাহারও অত্যল্প, কিন্তু অল্পাধিক পরিমাণে শুক্রকে ব্যয়ের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া শরীর-মধ্যে পুনঃসঞ্চারিত করিবার স্বাভাবিক সামর্থ্য প্রত্যেকেরই আছে। অণ্ডকোষদ্বয়ে স্বভাবতঃই নিয়ত রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া কামচিন্তা বা কামচেষ্টার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রতি জীবদেহে অল্পাধিক শুক্র অণ্ডকোষ হইতে শুক্রকোষদ্বয়ে আসিয়া জমিতেছে। এই শুক্রের সবটুকুই যদি কাহারও শরীর মধ্যে পুনর্গৃহীত (absorbed) হইয়া যায়, তবে তেমন পুরুষকে ঊর্দ্ধরেতা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়ত কুচিন্তা করিলে অণ্ডকোষ হইতে এত অধিক পরিমাণ শুক্র আসিয়া শুক্রকোষে জমিতে থাকে যে, তাহার সবটুকু ত' দূরের কথা, অর্দ্ধাংশকে শরীর-মধ্যে পুনর্গৃহীত করাইবার সামর্থ্য জীবদেহের নাই। এজন্যই কুচিন্তা-পরায়ণ ব্যক্তির

পক্ষে শত চেষ্টা সত্ত্বেও শুক্রক্ষয় সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং কুচিন্তার উপরে খড়্গহস্ত হইয়া চলা একান্তই আবশ্যক। অবশ্য কুচিন্তাকে লাঠী-পেটা করিয়া মনের মন্দির হইতে সরাইয়া দেওয়া প্রারম্ভিক উপায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই উপায় বড়ই ফলপ্রদ। কিন্তু এই সকল স্থলে মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কুচিন্তা আবার আসিবার চেষ্টা করে। ভগবৎ-সাধনার শক্তিতে কু'কে সু'তে রূপান্তরিত করিয়া লইবার চেষ্টা এই জন্যই স্থায়ী ভাবে নিরাপদ। ভগবৎ-সাধনার নিবিষ্টতা হইতে এমন হয় যে, সাধকের স্বভাবই দিব্য হইয়া যায়, তখন আর কুচিন্তা তাহাকে স্পর্শ মাত্র করিতে সাহস পায় না,—মক্ষিকা যেমন পচার গন্ধে নিকটে আসে কিন্তু ঘৃতের গন্ধে দূরে সরে।

কামচিন্তা ব্যতীতও যদি তোমার নিদ্রাযোগে বীর্য্যক্ষয় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেহের বীর্য্যক্ষয় সম্পর্কিত স্নায়ু ও শিরাসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ঐ দুর্ব্বলতা হ্রাসের জন্যই ব্যায়াম, আসন ও মুদ্রা আবশ্যক। কতকগুলি আসন-মুদ্রা আছে, যাহার অভ্যাসে ক্ষয়োন্মুখ বীর্য্যকে শরীর-মধ্যে পুনর্গ্রহণের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যথা,—সন্দীপনী-মুদ্রা, সঞ্জীবনী-মুদ্রা, কুলাঞ্জনী-মুদ্রা প্রভৃতি। কিন্তু একদিনেই যেমন বীজ হইতে গাছ হয় না এবং একদিনেই যেমন ফুল হইতে ফল হয় না, তেমনই স্নায়ুসমূহেরও উপযুক্ত দৃঢ়তা একদিনেই সম্পাদিত হয় না। অভ্যাস হইতেই সিদ্ধিলাভ হয়।

ব্যায়াম, আসন, মুদ্রা ও ধ্যানাদির দ্বারা কেন যে বীর্য্যক্ষরণের সম্ভাবনা কমিয়া যায়, তাহার এক সংক্ষিপ্ত যুক্তিও এখানে দিতেছি।

শরীরের যাবতীয় স্নায়ুর মূলকেন্দ্র মস্তিষ্কে। সুতরাং বীর্য্যক্ষয়ের জন্য প্রথমতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনা আবশ্যক হয়ই। কোনও প্রকারে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে সামর্থ্য সম্পাদিত হইলে উত্তেজনার সম্ভাবনাও হ্রাস পাইবে, ফলে বীর্য্যক্ষয়ের প্রবণতা কমিবে। মস্তিষ্কে ও ভ্রূমধ্যে ধ্যান দ্বারা বা মনঃসন্নিবেশাদি দ্বারা এবং জালন্ধর-বন্ধ প্রভৃতির দ্বারা মস্তিষ্কের উত্তেজনাশীলতা হ্রাস পায়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া নিম্নাভিমুখীন হয় বলিয়াই বীর্য্যস্খলন সম্ভব হয়। সুতরাং যে সব প্রক্রিয়াবলম্বন করিলে, মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ স্নায়ুসমূহের সুস্থতা অটুট থাকে, তাহা অভ্যাস করি:ল, বীর্য্যক্ষয়ের সম্ভাবনা কমিবেই। এই জন্যই ষট্‌চক্রভেদ, অযাচকাশ্রমীর জগন্মণ্ডল-পরিভ্রমণ, সপ্রণতি কূর্ম্মাসন, কুণ্ডলিনী-মুদ্রা, মহামুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মচারীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত :হয়। মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্ত হইতে রতিস্নায়ুর বহু শাখা-প্রশাখা পুরুষাঙ্গের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। রতি-স্নায়ুর মধ্য দিয়াই শক্তি-প্রবাহ জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি যন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং কাম-চিন্তাকালে রক্তপ্রবাহে প্রাবল্য সংঘটন করিয়া জননেন্দ্রিয়ের উত্থানশীল পেশীসূত্রগুলি:কে উত্তেজিত করতঃ বীর্য্যক্ষয়ের আনুকূল্য করে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা রতি-স্নায়ুর অচঞ্চলতা বজায় রাখা যায়, তাহা অভ্যাস করিলে বীর্য্যক্ষয়ের প্রবণতা কমিবেই। এই জন্যই মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে ধ্যান মহোপকারী। জনন-যন্ত্রের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া যে অসংখ্য রক্তবহা শিরা ও উপশিরাসমূহ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যখন রক্তস্রোত প্রবলবেগে আসিতে থাকে, তখনই জনন-যন্ত্রের উত্তেজনা জন্মে। সেই রক্তস্রোতকে অন্য পথে দেহাভ্যন্তরে প্রেরণের যে ব্যবস্থা আছে, উত্তেজনার সময়ে যোনিলিঙ্গ (Crus Penis) এবং

তদাবরক কুঞ্চনশীল পেশীসমূহ (Erector Penis) এই ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় বলিয়াই বীর্য্যক্ষয় সম্ভব হয় (২৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৯ পংক্তি এবং ৩০ পৃষ্ঠা ১ হইতে ১৫ পংক্তি দ্রষ্টব্য।) সুতরাং যে সব প্রক্রিয়াতে যোনিলিঙ্গাদির কুঞ্চনশীলতা হ্রাস পায়, তাহা বীর্য্য-ধারণের সহায়ক হইবেই । এই জন্যই মূলাধার (অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে) ধ্যান, অশ্বিনী-মুদ্রা, যোনিমুদ্রা প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর পরম বান্ধব। কামোত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হইলে শুক্রকোষদ্বয়ে Seminal Vesicles) পুনঃ পুনঃ কুঞ্চন হয় (৩১ পৃষ্ঠার শেষ ১১ পংক্তি এবং ৩২ পৃষ্ঠার প্রথম ৩ পংক্তি দ্রষ্টব্য) এবং এই জন্যই বীর্য্য দেহাভ্যন্তর হইতে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া পড়ে । সুতরাং যে উপায় অবলম্বন করিলে শুক্রকোষের এই কুঞ্চনশীলতা থাকিবে না, তাহাও বীর্য্যরক্ষক । এই জন্যই স্বাধিষ্ঠানে (অর্থাৎ উপস্থের যে অংশ নিম্নোদরের অভ্যন্তরে রহিয়াছে, তাহার মূলদেশে), কামগ্রন্থিতে (৩০ পৃষ্ঠার ১৬ এবং ৩১ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তি দ্রষ্টব্য) মনঃস্থির করা ব্রহ্মচর্য্যের উপচায়ক । একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, যোগশাস্ত্র এইরূপ নির্ভুল বিচার ও সূক্ষ্মদৃষ্টির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অতঃপর কতিপয় মুদ্রার বিষয় লিখিত হইতেছে। যথা,—

জালন্ধর-বন্ধ মুদ্রা :—কণ্ঠ সঙ্কোচপূর্ব্বক হৃদয়ে চিবুক সংন্যস্ত করিলেই জালন্ধর-বন্ধ হয়। ইহা মনঃসংযমের সহায়ক।

জালন্ধর-বন্ধে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস গ্রহণানন্তর কণ্ঠ হৃদয়ে সংন্যস্ত করিতে হইবে। অস্বাভাবিক ভাবে অত্যধিক বায়ুপূরণ করিয়া জালন্ধর-বন্ধ করিতে হইবে না।

* * **মস্তকাবর্ত্তনী মুদ্রা** :—আস্তে আস্তে মস্তকটী একবার সাধ্যমত বাম দিকে এবং একবার সাধ্যমত দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তিত করিয়া প্রতি আবর্ত্তনে একবার প্রণব স্মরণ করিতে হয়। ইহা অভ্যাসের দ্বারা বীর্য্যক্ষয়ের মস্তিষ্কগত কারণসমূহের দ্রুত প্রতিষেধ হয়। Cerebrum ও Cerebellum নামক মস্তিষ্কাংশদ্বয়ের অবসাদ ইহা দ্বারা দূর হয় বলিয়াই ইহা এত উপকারী। প্রত্যহ ব্যায়ামের সময়ে অথবা ভগবদুপাসনা করিতে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে মহামুদ্রা করিবার প্রাক্কালে ইহা অভ্যাস করা যাইতে পারে। দৈনিক ১০০ হইতে ৩০০ বার নিরাপদে ইহার অভ্যাস চলিতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনও নিয়ম নাই এবং নিয়ম থাকা সম্ভবও নহে, কারণ মস্তকাবর্ত্তনকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর জোর খাটাইতে গেলে অসুবিধা অনিবার্য্য ;—সুতরাং স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসই চলে।

কণ্ঠাকুঞ্চনী মুদ্রা :—কণ্ঠ ও গ্রীবার উভয় পার্শ্বস্থিত শিরা ও উপশিরাসমূহকে একবার আকর্ষণ করা ও একবার ছাড়িয়া দেওয়াই এই মুদ্রার বিশেষত্ব। ইহা অভ্যাসের দ্বারা সম্ভবতঃ উপকণ্ঠাস্থির দুই পার্শ্বস্থিত যৌবনগ্রন্থির (Thyroid Gland-এর) ক্রিয়া-বৈষম্য দূরীভূত হয় বলিয়াই সমগ্র শরীরের উপর সূক্ষ্মভাবে আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইয়া থাকে। দৈনিক ৩০ বার হইতে ২০০ বার পর্য্যন্ত অভ্যাস করা যাইতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই।

* * **কণ্ঠাবর্ত্তনী মুদ্রা** :—কণ্ঠনালীর অস্থিমালাকে একবার ঊর্দ্ধে এবং একবার অধোদেশে আবর্ত্তিত করিতে হয়। এইরূপ মুহর্মুহু করিতে থাকিলেই কণ্ঠাবর্ত্তনী মুদ্রা হইয়া থাকে। যোগীরা

বলেন,—ইহা যৌবন-বৰ্দ্ধক, কণ্ঠরোগ-নাশক ও ক্ষয়প্রতিষেধক। যৌবন-গ্রন্থি Thyroid Gland) এবং উপকণ্ঠ-গ্রন্থি (Parathyroid Gland) এর উপরে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার বশতঃ ইহা হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

* * **মূৰ্দ্ধাকর্ষণী মুদ্রা** :—দন্ত-পংক্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী প্রান্তকে কৌশল-বিশেষের সহায়তায় আকর্ষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তালুদেশে এক প্রবল টান অনুভূত হয়। ইহাই এই মুদ্রার বিশেষত্ব। ইহা অভ্যাসের ফলে Cerebrum, Cerebellum, Anterior Pituitary Gland, Posterior Pituitary Gland প্রভৃতি মস্তিষ্কের প্রায় সৰ্ব্বাংশের জড়তা দূর হয় বলিয়া ইহা স্মৃতিশক্তি-বৰ্দ্ধক, আলস্য-নাশক, তন্দ্রাবিদূরক, বুদ্ধিবিকাশক, চক্ষুর দীপ্তি-বৰ্দ্ধক, মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিকারক এবং মস্তিষ্কগত দৌর্ব্বল্যহেতু বীর্য্যক্ষয়কর সর্ব্ববিধ রোগে উপকারক। দৈনিক ৫ বার হইতে আরম্ভ করিয়া অভ্যাসের পরিপক্কতার সহিত ১০০ বার পর্য্যন্ত করা চলে। প্রথম সময়ে দৈনিক দুই তিন বার করিলেই যথেষ্ট মনে করি।

শ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য ধীর, অতি ধীর নহে, কুম্ভক নহে, মূৰ্দ্ধাকুঞ্চন-কালে শ্বাস-গ্রহণ ও বিকর্ষণকালে প্রশ্বাস ত্যাগ বিধেয়। এই মুদ্রার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম কাহারো কাহারো পক্ষে কঠিন হয়। তাহারা যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে কোন লক্ষ্যই না দেয়।

* * **সন্দীপনী-মুদ্রা** :—নাভি এবং নিম্নোদর ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিয়া পৃষ্ঠের সহিত সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এমন ভাবে ইহা অভ্যাস করিতে হইবে যেন নাভির ঊর্দ্ধে উদরের যে অংশটুকু আছে, তাহা সঙ্কুচিত না হয়। এই মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা

সর্ব্ববিধ অজীর্ণ রোগ নাশ হয়। অগ্নি-সন্দীপিত হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতাজনিত বীর্য্যক্ষয় প্রশমিত হয়। প্রারম্ভকালে প্রত্যহ পাঁচটী এবং ক্রমে বাড়াইয়া পঞ্চাশটী পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়। প্রথম সময়ে দৈনিক দুই তিনবার করিলেই যথেষ্ট মনে করি।

সন্দীপনী-মুদ্রাভ্যাস-কালে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম এই যে, নিম্নোদরের কুঞ্চনকালে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রসারকালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। বীর্য্যধারণোদ্দেশ্যে সন্দীপনী-মুদ্রা নিম্নোদরের আকুঞ্চন-কালে কিছুকাল কুম্ভক করণীয় কিন্তু কষ্টকরভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নহে।

দেখা গিয়াছে যে, সন্দীপনী-মুদ্রা অভ্যাসের ফলে বহু ব্যক্তির শুধু অজীর্ণ রোগেরই নাশ হইয়াছে বা বীর্য্যক্ষয়ই প্রশমিত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহা অভ্যাসের দ্বারা বহুমূত্র রোগও কমিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, এই মুদ্রাটি অভ্যাসের ফলে Pancreas নামক গ্রন্থির মধ্যে এমন কোনও অদৃশ্য শক্তি সঞ্চারিত হয়, যাহা দ্বারা তাহার ক্রিয়া-বৈষম্য বিদূরিত হয়।

সন্দীপনী-মুদ্রা অভ্যাসের ফলে বীর্য্যধারণের ক্ষমতা আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অণ্ডকোষ হইতে যে শুক্র নিয়ত সূক্ষ্মভাবে ক্ষয়ের জন্য আসিয়া শুক্রকোষে (Seminal Vesiclesএ) জমিতে থাকে, সেই শুক্রকে পুনরায় শরীর-মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার শক্তি এই সন্দীপনী-মুদ্রা অভ্যাসের ফলে শুক্রকোষের বাড়িতে থাকে। এই জন্যই ইহা ঊর্দ্ধরেতাসাধনের পরম সহায়ক। কিঞ্চিৎ শুক্র শরীর-মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ক্ষমতা শুক্রকোষের স্বভাবতঃই রহিয়াছে। এই মুদ্রা অভ্যাসে সেই শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা তলপেটের এক অপূর্ব্ব ব্যায়াম। এই ব্যায়ামে বীর্য্যধারণের শক্তি বাড়ে এবং স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়।

সাধ্যের অতীত বল প্রয়োগ করিয়া ভারোত্তোলনাদি কার্য্য করাতে অথবা অত্যন্ত লম্ফঝম্ফ-সঙ্কুল কার্য্যাদির ফলে বা অপরাপর কারণে যে সকল পুরুষের পাকস্থলী বা যে সকল নারীর পাকস্থলী বা জরায়ু ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এই মুদ্রাটি তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেই সকল বিবাহিত পুরুষ স্বীয় পুরুষোচিত শক্তি-সামর্থ্য হারাইবার ফলে অপুত্রক থাকিতে বাধ্য হইয়াছে, এমন অনেক ব্যক্তি গুরু-মুখ-কথিত নির্দ্দেশ অনুসারে এই মুদ্রার অভ্যাস করিয়া বংশ-রক্ষার পূর্ণ সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। এইগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ সত্য। দুঃশীলা অবাধ্য স্ত্রীকে বশীভূত করিতে অক্ষমস্বামী সন্দীপনী-মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা অসাধারণ সামর্থ্যের অধিকারী হওয়াতে সংসারে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

* * **স্বপ্নসন্দীপনী-মুদ্রা** :—ইহা মেয়েদেরই জন্য। পৃষ্ঠদেশ শয্যায় বা আসনে সংলগ্ন করিয়া শয়ন করিতে হইবে। বিছানা বা আসন যেন উঁচু নীচু না হয়। আঁটা-সোটা পোষাক বর্জ্জন করিয়া ইহা করিতে হইবে। একটি হাতের কনুইয়ের উপরে মাথাটি রাখ, অপর হাতের তালুটি তলপেটের উপরে চাপ না দিয়া সাধারণভাবে রাখিয়া দাও। পদদ্বয়কে গুটাইয়া আন। হাঁটু দুইটি ঊর্দ্ধদিকে থাকিবে এবং পায়ের গোড়ালিদ্বয় গুহ্যদেশের যত সন্নিকটে সম্ভব, ততটা সন্নিকটে আসিবে। যে হাত তলপেটের উপরে রাখিয়াছ, সেই হাতটী দ্বারা পেটের উপরে বিন্দুমাত্রও চাপ দিতে পারিবে না। এখন শুধু তলপেটটীকে এমন ভাবে ফুলাও, যেন তলপেটের উপরে যে হাতের তালু রাখিয়াছ, সেই হাতটি উপরের

দিকে উঠে। তৎপরে সমগ্র পেটটীকে (শুধু তলপেটই নহে) আবার নীচের দিকে সঙ্কুচিত কর। এইভাবে বারংবার করিতে থাকিলেই "স্বপ্নসন্দীপনী" মুদ্রা হইল।

এই মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা স্ত্রীলোকদের মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়ম এবং অসহ্য বেদনা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। কিন্তু গর্ভাবস্থায় ইহা নিষিদ্ধ।

বাংলার বয়স্কা কুমারী কন্যা ও পল্লীবধূরা মাসিক রজঃস্রাবের অনিয়মিততার জন্য দিন দিন স্বাস্থ্য হারাইতেছেন এবং পরিণামে প্রদর, বাধক প্রভৃতি রোগের আকরস্বরূপা হইতেছেন। অনিষ্টজনক-প্রতিক্রিয়াহীন নিরাপদ এই মুদ্রাটী তাঁহাদের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইবে। মাসিক ঋতুস্রাবের প্রথম তিন দিবস বাদ দিয়া "স্বপ্নসন্দীপনী" তাঁহারা দৈনিক দুই সময়ে করিবেন। প্রত্যেক যুবকের কর্ত্তব্য নিজ নিজ বয়স্কা কুমারী ও বিবাহিতা ভগ্নীদিগকে এই মুদ্রাটী অভ্যাসে উৎসাহ প্রদান করা। রজঃকষ্ট, রজঃকৃচ্ছ্রতা ,ঋতুস্রাবকালীন উৎকট বেদনা ও অবসাদ, অনিয়মিত স্রাব, অতিস্রাব, বহু-দিবস-ব্যাপী স্রাব প্রভৃতি ইহা অভ্যাসে নিবারিত হয়।

[স্বপ্ন-সন্দীপনী-মুদ্রা মেয়েদের অভ্যাসের জন্য। তথাপি ইহা ছেলেদের জন্য লিখিত পুস্তকে সন্নিবেশ করিবার কারণ এই যে, মেয়েদের জন্য আর পৃথক্ ভাবে সংযম-সাধনার মত পুস্তক লিখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে না। এই পুস্তকে লিখিত সকল আসন-মুদ্রাই মেয়েরা অবাধে অভ্যাস করিতে পারে। স্বপ্ন-সন্দীপনী-মুদ্রা মেয়েদের পক্ষে কাম-শান্তিকর। কারণ, ইহা জরায়ুর অস্বাভাবিকতা হ্রাস করে। মহিলাদের মধ্যে যাহাদের কোনও কারণ বশতঃ জরায়ুর স্থান- ভ্রষ্টতা জন্মিয়াছে, দীর্ঘ-প্রযত্নে অভ্যাসের ফলে তাহাদের পক্ষে

সন্দীপনী এবং স্বপ্নসন্দীপনী এই দুইটী মুদ্রা আশ্চর্য্য ফলজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।]

এই মুদ্রাটী অভ্যাস করিবার কালে শ্বাস বন্ধ করিতে হইবে না। শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বাভাবিক ভাবে চলিতে দিতে হইবে। শ্বাস বন্ধ করিবার কদভ্যাস যাহাদের আছে, তাহাদের পক্ষে দুই চারিদিন হাঁ করিয়া মুখ খুলিয়া রাখিয়া অভ্যাস চলিতে পারে।

অপরাপর সকল মুদ্রারই ন্যায় এই মুদ্রা করিবার পুর্ব্বেও মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া মূত্রাশয়কে খালি করিয়া লওয়া দরকার।

উড্ডয়নবন্ধ-মুদ্রা :—নাভিকে পৃষ্ঠ-সংলগ্ন করিয়া সমগ্র উদরটীকেই ভিতরের দিকে চাপিয়া রাখিবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম সন্দীপনী-মুদ্রার বিপরীত অর্থাৎ উদরের কুঞ্চনকালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। উড্ডয়নবন্ধ মুদ্রায় ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রশ্বাসকে ধীর করিতে বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যথাসাধ্য বায়ু রেচন করিয়া উদর চাপিতে বা আকর্ষণ করিতে যাইও না। উদরকে পৃষ্ঠ-সংলগ্ন করিবার প্রয়াসের ফল-স্বরূপে বায়ুর রেচন-ক্রিয়া আপনা-আপনি যদ্রূপ হয়, হউক। সন্দীপনী মুদ্রা অভ্যাসকারীদের পক্ষে কতিপয় ব্যতিক্রম-স্থান ব্যতীত কয়েকবার করিয়া উড্ডয়নবন্ধ মুদ্রা করাও কর্ত্তব্য। তাহাতে অগ্নির বল অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

* * **বিঘোটনী-মুদ্রা** :—প্রথমতঃ পেটের উর্দ্ধ অংশে একটি খাঁজ সৃষ্টি করিয়া সেই খাঁজটিকে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা কিছুকাল অভ্যাস করিতে করিতে বিনা চেষ্টায় "সন্দীপনী-মুদ্রা" অভ্যাস হইয়া যায় বলিয়া ইহা অভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়। নতুবা ইহা নিষ্প্রয়োজনীয়।

ক্ষমতাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করিয়া ভারোত্তোলনের কার্য্যের দরুণ যে সকল পুরুষের অন্ত্রের ও পাকস্থলীর, বা যে সকল স্ত্রীলোকের অন্ত্র বা জরায়ুর স্থানচ্যুতি হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা হিতকর ত নহেই, বরঞ্চ অতীব ক্ষতিকর। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

* * **পর্য্যায় সন্দীপনী** :—প্রথমতঃ একবার উদরের ঊর্দ্ধাংশকে সঙ্কুচিত করিয়া সেই সঙ্কোচ ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় উদরের নিম্নাংশকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে। এই মুদ্রা অভ্যাসে "সন্দীপনী-মুদ্রা" অভ্যাসের যাবতীয় সুফল লাভের সহিত যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য নিবারিত হইবে।

তলপেট সঙ্কোচনের কালে শ্বাস গ্রহণ ও উদরের ঊর্দ্ধাংশ সঙ্কোচনের কালে প্রশ্বাস ত্যাগ বিধেয়।

কুণ্ডলিনী-মুদ্রা :—মুক্তপদ্মাসন করিয়া দুই কনুইয়ের দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিবে। তৎপরে পদদ্বয় ভূসংলগ্ন রাখিয়াই আস্তে আস্তে উঠিবার চেষ্টা করিবে, ইহা দ্বারা নিম্নাঙ্গের যে ব্যায়াম হয়, তাহাতে বীর্য্যবহা স্নায়ুর ও অন্যান্য আবশ্যকীয় রতিস্নায়ু-সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।—একান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপ্রশস্ত।

মহামুদ্রা :—মহামুদ্রা মুদ্রাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন-রূপে অনুষ্ঠিত হয়। ঘেরণ্ড-সংহিতার মতে বাম গোড়ালি দ্বারা গুহ্যদেশ চাপিয়া রাখিয়া দক্ষিণ পদ প্রসারিত করতঃ হস্তদ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিলে এবং কণ্ঠসংকোচনপূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মহামুদ্রা হয়। গ্রহ-যামলের মতে, মুখ কণ্ঠে সংন্যস্ত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ুরোধ করিতে হইবে এবং পরে ঐ কুম্ভকরুদ্ধ

বায়ু ধীরে ধীরে রেচন করিবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীরা এতদুভয় মতের বিভিন্ন রূপে সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক প্রথমে দক্ষিণ পদ, তৎপর উভয় পদ এবং তৎপর বাম পদ প্রসারিত করিয়া মহামুদ্রা করেন। অযাচক আশ্রমভুক্ত "অখণ্ড" সাধকগণ মহামুদ্রার তিনটী বিশেষ সংস্করণকে "স্বল্পমহামুদ্রা"; "লঘু-মহামুদ্রা" ও "শক্তিসঞ্চালনী মহামুদ্রা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল। কিন্তু তথাপি পুস্তক দেখিয়া সম্ভবতঃ ইহা অভ্যাস করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে না। সুতরাং সুযোগ হইলে কোনও অভ্যাসকারীর নিকট হইতে ইহা দেখিয়া লওয়াই অধিকতর সুবিধাজনক, যদিও নিজে নিজে শিখিলে ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

* * **স্বল্প মহামুদ্রা** ঃ—পদদ্বয় সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়া পদাঙ্গুলিসমূহ ঊর্দ্ধমুখ রাখিয়া দুই গোড়ালি একত্র করিবে। তৎপরে গোড়ালিদ্বয়কে নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ রাখিয়া একবার দক্ষিণ জানু প্রায় ছয় ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চি পরিমাণ উন্নয়িত করিয়া বাম জানুকে ভূমিতলে সংলগ্ন করতঃ মেরুদণ্ড সরল করতঃ কটিদেশ সম্মুখে অবনমিত করিয়া মস্তককে যথাসম্ভব পদাঙ্গুলির দিকে অগ্রসর করাইতে হইবে এবং পুনর্ব্বার বাম জানু প্রায় ছয় ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চি পরিমাণ উন্নয়িত করিয়া দক্ষিণ জানুকে ভূমিতলে সংলগ্ন করতঃ কটিদেশ সম্মুখে অবনমিত করিয়া মস্তককে যথাসম্ভব পদাঙ্গুলির দিকে অবনমিত করাইতে হইবে। যে পায়ের হাঁটুটী যখন মৃত্তিকা বা আসনের সহিত সংলগ্ন থাকিবে, সেই চরণের অঙ্গুলিসমূহ সুদূরে সরল ভাবে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পাইবে এবং যে পায়ের হাঁটুটী যখন ঊর্দ্ধে উন্নয়িত হইবে,

সেই পায়ের অঙ্গুলিসমূহ তখন বক্র করিয়া নিজের শরীরের দিকে টানিয়া আনিতে হইবে। (১২২ পৃষ্ঠার ৫ম চিত্র)

এইরূপ পঞ্চাশবার হইতে একশতবার পর্য্যন্ত একজন নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিও করিতে পারে। গর্ভের পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত এবং প্রসবের দ্বাবিংশ দিবস পরে একজন স্ত্রীলোক অথবা একজন সত্তর-বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধও স্বল্প-মহামুদ্রা নিরাপদে অভ্যাস করিতে পারেন। পদ-শিরার বাতরোগ অর্থাৎ সায়াটিকা নিবারণে ইহার সামর্থ্য অসাধারণ। ক্রমান্বয়ে সাত দিন অভ্যাস করিলে ইহার অব্যর্থ শক্তি সুনিশ্চিত উপলব্ধ হইবে।

দীর্ঘপথ পর্যটন করিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ ইহা অভ্যাস করিলে সঙ্গে সঙ্গে পায়ের সকল শ্রান্তি দূর হইয়া যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক,—শ্বাস-প্রশ্বাসের আগম বা নির্গমের সহিত ইহা অভ্যাসের কোন সম্পর্ক নাই।

* * **লঘুমহামুদ্রা**:—পদদ্বয় পশ্চাতে গুটাইয়া উপবেশন করিবে (আসনীয়া) এবং চিবুক কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া নাভিমূলে দৃষ্টি দিয়া শ্বাসের সহিত একবার এবং প্রশ্বাসের সহিত আর একবার নাম † জপ করিবে।

তৎপর বামপদ পূর্ব্বাবস্থাতেই রাখিয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে প্রসারিত করিবে এবং হস্তের তর্জ্জনীদ্বয়কে অঙ্কুশবৎ গুটাইয়া হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও অঙ্কুশবৎ-গুটান তর্জ্জনী দ্বারা চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করতঃ কণ্ঠে চিবুক সংলগ্ন করিয়া ভ্রূমধ্যে অথবা পদনখাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শ্বাসের সহিত একবার ও প্রশ্বাসের সহিত একবার নাম জপ করিবে (দক্ষিণ)।

---

† নাম বলিতে বার বার ইষ্টনাম বুঝিবে। যাহারা সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত নহে, তাহারা

তৎপর দক্ষিণ পদ পূর্ব্ববৎ প্রসারিত রাখিয়া বামপদ প্রসারিত করিবে এবং উভয়পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শ্বাসে একবার ও প্রশ্বাসে একবার নামজপ করিবে (উভয়া)।

তৎপর দক্ষিণ পদ গুটাইয়া রাখিয়া প্রসারিত বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উভয় হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা ধরিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিবে এবং শ্বাস-যোগে একবার ও প্রশ্বাস-যোগে একবার নামজপ করিবে (বামা)।

এই লঘু মহামুদ্রা অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস অতি ধীর হইবে না, মধ্য-ধীর হইবে না, ঈষৎ-ধীর হইবে এবং চেষ্টাকৃত কুম্ভক-বর্জ্জিত হইবে (বিশিষ্টায়াম)।

উল্লিখিত নিয়মে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিয়া লঘুমহামুদ্রা অভ্যাস করিতে করিতে কিছু দিন পরে অনেকের এমন বোধ হয় যেন শ্বাস গ্রহণের পরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ভিতরে বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতে স্বাভাবিক রুচি এবং স্বাচ্ছন্দ্য জন্মে। এমতাবস্থায় শ্বাস গ্রহণের পরে কিয়ৎকাল কুম্ভক করা ভাল। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন এই কুম্ভক বলসহকৃত না হয় এবং ইহা যেন সামর্থ্যের অধিককাল জোর করিয়া ধরিয়া রাখা না হয়। জোর করিয়া সামর্থ্যের অধিককাল কুম্ভক-বায়ু ভিতরে ধরিয়া রাখিলে যে কত প্রকার দুরন্ত ব্যাধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে স্মরণ করাইয়া আমরা পাঠকদিগকে এই বিষয়ে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, দীর্ঘ কাল যাবৎ সমান প্রযত্নে কথিত-নিয়মে লঘুমহামুদ্রার অভ্যাস চালাইলে বিনা চেষ্টায় দীর্ঘকালব্যাপী স্বাভাবিক কুম্ভক হওয়াও মোটেই বিচিত্র নহে।

এই সময়ে নিজেদের প্রিয় যে-কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট নাম জপিবে। যাহারা স্বদেশ-সেবার জন্য জীবন গঠন করিতেছে, তাহারা দীক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে "বন্দেমাতরম্" বা "জয়-হিন্দ" বলিবে। যাহাদের দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ, তাহারা মন্ত্রের বীজ বা প্রাণটুকু জপিবে। যাহাদের মন্ত্রের দুইটী বীজ, তাহারা প্রথম বীজটী শ্বাসের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় বীজটী প্রশ্বাসের সঙ্গে জপিবে।

প্রথম অভ্যাসকালে লঘুমহামুদ্রা পাঁচটী করিয়া এবং ক্রমশঃ বাড়াইয়া একশতটী পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে।

নামজপ করিতে করিতে দেহে অত্যধিক আলস্য ও তন্দ্রালুতা জন্মিলে তাহা দূর করিয়া পুনর্ব্বার জাগ্রত চিত্তে জপে বসিবার জন্য লঘুমহামুদ্রা অভ্যাস করা যাইতে পারে, বীর্য্যক্ষয়াদির বিশেষ আশঙ্কা বোধ করিলে প্রতিষেধার্থে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বেও লঘুমহামুদ্রা করা যাইতে পারে, কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরে করা সঙ্গত নহে।

* * **শক্তিসঞ্চালনী মহামুদ্রা** :—ইহাতে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প-পূর্ব্বক পরিভ্রমণ আছে। তাহার ক্রম :—আসনীয়া = গুহ্যদ্বার হইতে মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক হইতে গুহ্যদ্বার। দক্ষিণা = পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ। উভয়া = বাম পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তিষ্ক হইয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ, দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তিষ্ক হইয়া বাম পদাঙ্গুষ্ঠ। বামা = পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ। শ্বাস-প্রশ্বাসে ও কুম্ভকে নামজপ। কুম্ভক কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে, স্বভাবের প্রায় অনুকূল, চক্ষু, মুদ্রিত, ভ্রূমধ্যে। প্রতি প্রক্রিয়ার শেষে মুখব্যাদান পূর্ব্বক গ্রীবা একবার পশ্চাৎদিকে বাঁকাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যোনিমুদ্রা করিবে।

আসনীয়া, দক্ষিণা, উভয়া ও বামার বিবরণ লঘুমহামুদ্রা সম্পর্কিত চিত্রে ১২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উল্লেখিত ত্রিবিধ মহামুদ্রা-কালেই তালুমুদ্রা (খেচরী মুদ্রা) হিতকর।

* * **সপ্তাবর্ত্তনী মহামুদ্রা** :—প্রথমতঃ বামপদ প্রসারিত করিয়া বাম কুঁচকি এবং মেঢ্রদেশের মধ্যস্থলে দক্ষিণ পদের গোড়ালি রাখিয়া বাম হস্তের দ্বারা বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে এবং

দক্ষিণ হস্তের তালুদেশ বহির্দ্দিকে রাখিয়া উত্তানভাবে দক্ষিণ হস্তের মেরুদণ্ডের পশ্চাৎ দিক দিয়া আনিয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে। তৎপরে বক্ষে চিবুক সংন্যস্ত করিয়া একবার বাম দিকে এবং একবার দক্ষিণ দিকে মস্তক আবর্ত্তিত করিবে এবং বাহু ও স্কন্ধের সংযোগ-স্থলকে দর্শন করিবে। এইরূপ সাতবার মস্তকাবর্ত্তন করিলেই এই মুদ্রা করা হইল। (১২২ পৃষ্ঠা ১ম চিত্র)

বামপদ প্রসারিত করিয়া প্রক্রিয়া শেষ হইবার পরে পুনরায় বিপরীত ভাবে দক্ষিণ পদ প্রসারিত করিয়া পূর্ব্ব-কথিত-রূপে মস্তকাবর্ত্তন করিতে হইবে।

প্রত্যেক বার মস্তকাবর্ত্তন-কালে হয় একটী শ্বাস গ্রহণ অথবা একটী প্রশ্বাস ত্যাগ এবং প্রতি শ্বাসে এবং প্রতি প্রশ্বাসে এক একবার করিয়া ঈশ্বরের নাম জপ বিধেয়। যাঁহারা সাবিত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা প্রতিবার মস্তকাবর্ত্তন-কালে যথাক্রমে ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্,—জপ করিতে পারেন। প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষিতগণের এই সপ্তব্যাহৃতি জপিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

এই মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা গ্রীবাদেশের শিরার বেদনা, দুর্ব্বলতা ও আড়ষ্টতা, অর্দ্ধাঙ্গ বাতব্যাধির প্রথম আক্রমণ এবং তজ্জনিত অনিদ্রা বিদূরিত হয়। এক উপবেশনে আট দশবার ইহার অভ্যাস চলিতে পারে। প্রথম সময়ে দুই তিনবারই যথেষ্ট।

মূলবন্ধ-মুদ্রা :—গুহ্যদ্বারকে আকুঞ্চন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দীর্ঘকাল রাখিলেই মূলবন্ধ মুদ্রা হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকই রহিবে।

অশ্বিনী-মুদ্রা :—অশ্বিনী-মুদ্রা মূলবন্ধ মুদ্রারই একটি উন্নত

সংস্করণ। মুহুর্মুহুঃ গুহ্যদ্বারকে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে থাকিলেই অশ্বিনী-মুদ্রা হয়। এখানে প্রসারণ বলিতে কুন্থন বুঝিবে না। প্রসারণ বলিতে আকুঞ্চন-বর্জ্জন বুঝিতে হইবে।

অশ্বিনীমুদ্রা শক্তিপ্রবোধকারিণী এবং গুহ্যরোগনাশিনী বলিয়া যোগশাস্ত্রে বহুল প্রশংসিত। অর্শরোগের ইহা এক বিখ্যাত প্রতিষেধক।

অশ্বিনীমুদ্রা অভ্যাসকালে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবে এবং শ্বাস গ্রহণকালে গুহ্যদ্বার আকুঞ্চিত ও প্রশ্বাস-ত্যাগ কালে আকুঞ্চন পরিহার করিবে। যাহাদের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত অল্পকালস্থায়ী, তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে কোনও লক্ষ্যই দিবে না।

যোনিমুদ্রা ঃ—যোনিমুদ্রা অশ্বিনীমুদ্রারই একটি উন্নততর সংস্করণ। ধীরতার সহিত গুহ্যদ্বার দেহাভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া অর্দ্ধ বা সিকি মিনিট কাল তদবস্থায় রাখিবে। কুঞ্চনমান গুহ্য-তন্ত্র-সমূহের স্পন্দনের ধ্বনির প্রতি মনঃসন্নিবেশ করিলে যে এক নাদ শ্রুত হইবে, তাহাকে প্রণব (ওঁ) রূপে কল্পনা করিবে এবং মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সেই ধ্বনি যেন ভ্রূমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে, চিন্তাবলে এইরূপ অনুভব করিতে চেষ্টা পাইবে। ইহাকেই বলে যোনিমুদ্রা। ওঙ্কারধ্বনি ভ্রূমধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এইরূপ অনুভব করিবার পরে গুহ্যদেশের আকুঞ্চন ছাড়িয়া দিতে হয়। এইভাবে যোনিমুদ্রা সংখ্যা রাখিয়া একুশবার করিবে। ত্রিসন্ধ্যায় উপাসনা করিতে, রাত্রিতে শয়নের প্রাক্কালে নামজপের পূর্ব্বে (মহামুদ্রা ও স্তোত্রাদি পাঠের পরে) ইহা করিবে। ইন্দ্রিয়-সংযম-সাধনে ইহার সমকক্ষ মুদ্রা অতি অল্পই আছে। প্রচণ্ড লৈঙ্গিক উত্তেজনার সময়েও যোনিমুদ্রা করিতে থাকিলে জননেন্দ্রিয় স্থির ও

শান্ত হইয়া যায়। কিন্তু তজ্জন্য কোনও ক্ষতিকর প্রক্রিয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।

যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিতে প্রথম প্রথম শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি কোনও লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। গুহ্যমূলে মনঃসন্নিবেশন এবং উপলব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির ঊর্দ্ধগমন অনুভবের চেষ্টাই প্রথম সময়ে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস করিলে পরে ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করার দিকেও অভ্যাসকারীর দৃষ্টি পড়ে এবং রুচি জন্মে। সেই সময়ে নিম্নরূপ উপদেশ পালনীয়। যথা,—গুহ্যদেশ আকর্ষণ কালে ধীরে ধীরে (অতি ধীরে নহে) শ্বাসগ্রহণ, গুহ্যদেশের আকৃষ্ট অবস্থায় শ্বাসবায়ু অভ্যন্তরে ধারণ, গুহ্যদেশের আকুঞ্চন ছাড়িয়া দিবার সময়ে স্বাভাবিক ভাবে (চেষ্টাপূর্ব্বক ধীর গতিতে নহে) শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। শ্বাস গ্রহণ কালে শ্বাসের উপর বেশী জোর খাটাইবে না, কুম্ভক কালে নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাল বায়ু রুদ্ধ রাখিবে না।

যোনিমুদ্রা অভ্যাস-কালে উপস্থকে সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চিত করিতে হইবে না। প্রথম প্রথম অনেকেরই গুহ্যদেশ আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থের আকর্ষণ হইতে চাহিবে। কিন্তু কিছুকাল অভ্যাসের পরে আপনিই এই ত্রুটি নিবারিত হইবে।

যোনিমুদ্রা অভ্যাসকালে গুহ্যদ্বার আকুঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে ওঁ-ধ্বনি স্বভাবতঃ যদি শ্রুত না হয়, তবে প্রথম অভ্যাকারীর পক্ষে কল্পনার দ্বারা এই নাদ শ্রবণের চেষ্টা করিতে হইবে।

তান্ত্রিক সাধকদের কেহ কেহ এক প্রকারের যোনিমুদ্রা উপদেশ করিয়া থাকেন, যাহার সহিত শ্লীলতার সম্পর্ক অত্যল্প। অন্য প্রকারে উহার উপযোগিতা থাকুক আর না থাকুক, এই পুস্তকের

বর্ণিতব্য বিষয়ের সহিত উহার কোনও সংস্রব নাই। ইন্দ্রিয়-সংযম-সাধনের জন্য এই পুস্তকে বর্ণিত এবং অশ্লীলতার সহিত সম্পূর্ণ-সংস্রব-বর্জ্জিত যোনি-মুদ্রাই প্রকৃত যোনিমুদ্রা। বৈদান্তিকেরা এক প্রকার সূক্ষ্ম যোনিমুদ্রা স্বীকার করেন, ইহা হইতেছে, জীব ও ব্রহ্মের মিলন-মূলক ধ্যান-লব্ধ আনন্দানুভূতি। এই পুস্তকে বর্ণিত যোনিমুদ্রা সেই সূক্ষ্ম যোনিমুদ্রার প্রথম সোপান স্বরূপ।

* * **মহাযোনি মুদ্রা** :—যোনিমুদ্রার প্রক্রিয়ার ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া গুহ্যদেশের প্রসারণকালে পুনরায় ঐ পথেই ওঙ্কার শ্রবণ করিতে করিতে অবতরণ করিতে হয়। এইরূপ বারংবার ওঠানামা চলে।

* * **সঞ্জীবনী-মুদ্রা** :—সন্দীপনী-মুদ্রা এবং যোনিমুদ্রা এতদুভয়কে একযোগে করিলেই সঞ্জীবনী মুদ্রা হয়। ইহা অভ্যাস করিলে একযোগে উভয় মুদ্রারই সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুইটি মুদ্রা যাহারা পৃথক্‌রূপে উৎকৃষ্ট ভাবে অভ্যাস করে নাই, তাহাদের পক্ষে প্রথম ধরিয়াই সঞ্জীবনী-মুদ্রা অভ্যাস করিতে যাওয়া অসঙ্গত হইবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম যোনিমুদ্রাবৎ।

গুহ্যমূল ও তলপেট সম্পর্কিত পূর্ব্বোক্ত ব্যায়ামগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ার পরে নিম্নবিবৃত জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তগুলি যাহার উৎকৃষ্টরূপে অভ্যাসগত হয় নাই, তাহার পক্ষে নিম্নোক্তগুলির অভ্যাস নিষিদ্ধ। বর্ণপরিচয় হইবার পূর্ব্বে যেমন সংযুক্ত অক্ষর শিক্ষা করা অসম্ভব, গুহ্যদেশ-সম্পর্কিত ব্যায়ামগুলি উৎকৃষ্ট রূপে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে তেমনি জননেন্দ্রিয়-সম্পর্কিত ব্যায়ামগুলি আয়ত্ত করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, **প্রত্যহ অভ্যাস করিবার কালেও একটী সতর্কতা**

অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে যে, জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রত্যহই অপরিহার্য্য রূপে কিয়ৎকাল গুহ্যদেশের ব্যায়াম (অশ্বিনী মুদ্রা বা যোনিমুদ্রা) করিয়া লওয়া চাই। এই সতর্কতা অবলম্বন না করিলে জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়ামে কোনও সুফল পাওয়ার আশা অনুচিত।

* * **সঙ্কিনী-মুদ্রা** :—মুহুর্মুহু উপস্থকে আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে। এবং আকুঞ্চন ছাড়িয়া দিতে থাকিবে। এই মুদ্রা অভ্যাস-কালে গুহ্যদেশ বিন্দুমাত্রও আকুঞ্চিত হইবে না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অশ্বিনী মুদ্রার অনুরূপ।

* * **যোগিনী-মুদ্রা** :—ধীরে ধীরে জননেন্দ্রিয়কে দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া অর্দ্ধমিনিট বা সিকি মিনিট কাল সে অবস্থায় রাখিবে এবং কল্পনা করিতে হইবে যেন, লিঙ্গমূল হইতে ওঙ্কারধ্বনি মেরুদণ্ড বাহিয়া একেবারে ভ্রূমধ্যে যাইয়া পৌঁছিতেছে। এই মুদ্রার অভ্যাস-কালেও গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত হইতে পারিবে না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ যোনিমুদ্রার অনুরূপ।

* * **পর্য্যায়-যোগিনী-মুদ্রা** :—একবার যোনিমুদ্রা করিয়া গুহ্য হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত ওঙ্কারের সঞ্চরণ অনুভব করিবে এবং তখনই গুহ্যমূলের আকর্ষণ ছাড়িয়া দিয়া আবার যোগিনী-মুদ্রা করিয়া অনুভব করিতে থাকিবে যেন উপস্থ হইতে প্রণবধ্বনি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ভ্রূমধ্যে পৌঁছিতেছে। এইভাবে একবার যোনিমুদ্রা ও তৎপরবার যোগিনীমুদ্রা পর্য্যায়ক্রমে করিতে থাকিবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম পর্য্যায়ক্রমে যোনি ও যোগিনীমুদ্রাবৎ।

---

* * তারকাচিহ্নিত আসনমুদ্রাগুলি কেহ গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত মুদ্রিত করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি যৌগিক পরিভ্রমণ এবং নামজপের অব্যবহিত পূর্ব্বে আসনে বসিয়া করিবে।

মুদ্রার নাম	১ম সঃ	২য় সঃ	৩য় সঃ	৪র্থ সঃ	৫ম সঃ	৬ষ্ঠ সঃ	৭ম সঃ	৮ম সঃ	৯ম সঃ	১০ সঃ	১১ সঃ	১২ সঃ
মূলবন্ধ	৫	৭	৭	৭	১০	১০	১৫	২১	২১	২১	২১	২১
উড্ডয়নবন্ধ	৩	৭	৭	৯	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	২১	২১	২১
অশ্বিনী	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
যোনি	৫	১৫	১৫	১৫	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
সন্দীপনী	৫	১৫	১৫	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
সঞ্জীবনী	....	....	....	৫	৭	১০	১৫	২১	২১	২১	২১	২১
সঙ্কিনী	....	....	....	....	....	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
যোগিনী	....	....	....	....	....	....	....	১০	২১	২১	২১	২১
পর্য্যায়-যোগিনী	....	....	....	....	....	....	....	৫	১৫	২১	২১	২১
যোনি-যোগিনী	....	....	....	....	....	....	....	....	১০	১৫	২১	২১
কুলাঙ্গনী	....	....	....	....	....	....	....	....	....	৫	১০	২১

এ.বু মহামুদ্রা এই তালিকায় লিপিবদ্ধ হইল না ; উহা সামর্থ্যানুযায়ী ধীরে ধীরে পাঁচটি হইতে একশতটি পর্য্যন্ত বাড়াইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য :—“সপ্তাহ” কথাটিকে সংক্ষেপে “সঃ” লেখা হইয়াছে।

* * **যোনি-যোগিনী-মুদ্রা** ঃ—একই সময়ে যুগপৎ যোনিমুদ্রা ও যোগিনীমুদ্রা অভ্যাস করিবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য যোনিমুদ্রাবৎ।

* * **কুলাঞ্জনী-মুদ্রা** ঃ—একই সঙ্গে যোগিনীমুদ্রা ও সঞ্জীবনী-মুদ্রা অভ্যাস করিতে থাকিবে। ইহাতে গুহ্যাকর্ষণ ব্যাপারটী যোনিমুদ্রার ন্যায় এবং ওঙ্কার-শ্রবণ-ঘটিত ব্যাপারটী যোগিনীমুদ্রার ন্যায়। এই মুদ্রার অভ্যাসে ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়, তাহার অন্ধ নয়নে জ্ঞানাঞ্জন পড়ে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম যোনিমুদ্রাবৎ।

অশ্বিনী, যোনি, মহাযোনি, সঞ্জীবনী, সঙ্কিনী, যোগিনী, পর্য্যায়-যোগিনী, যোনি-যোগিনী ও কুলাঞ্জনী এই মুদ্রা কয়টি স্ত্রীলোকদেরও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা-প্রশমনে এবং সংযম-সাধনে একান্ত সহায়িকা। যে সকল কুমারী বিবাহিতা জীবন গ্রহণ না করিয়া আমৃত্যু পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে ইচ্ছুকা তাহাদের প্রত্যেকেরই দৈনিক এইগুলি নিয়মিত অভ্যাস করা সঙ্গত। যে সকল বালবিধবা পুনরায় পতিগ্রহণ করিতে অনিচ্ছুকা, তাহাদের পক্ষেও এগুলি অভ্যাস করা আবশ্যক। যে সকল সধবা যুবতী রমণী নিজ নিজ স্বামীর সহিত সাধ্যমত পবিত্র ও প্রীতিপূর্ণ জীবন-যাপনে ইচ্ছুকা, তাহাদের পক্ষেও এগুলি হিতকর। সন্তান-লাভে ইচ্ছুকা রমণীদের এইগুলি অভ্যাসে কোনও কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কোনও স্ত্রীলোকের পক্ষেই নিজ স্বামী ব্যতীত অপর

কোনও পুরুষ-শিক্ষকের নিকটে ইহা শিক্ষা করা উচিত নহে। †

[নিয়মিত অভ্যাসকারী কি ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মুদ্রা-সংখ্যা বাড়াইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ১৪৪ পৃষ্ঠায় যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা দ্রষ্টব্য।]

এতদ্ব্যতীত **মূলশোধনী-মুদ্রা** প্রত্যহ অভ্যাস করাও বিশেষ হিতকর। মলত্যাগ করিবার পরে বামহস্তের মধ্যাঙ্গুলি গুহ্যমধ্যে অতি সন্তর্পণে প্রবিষ্ট করাইয়া জলদ্বারা গুহ্যের আভ্যন্তর প্রদেশ ধৌত করিবার নাম মূলশোধনী মুদ্রা। মূলশোধন করিলে অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি গুহ্যরোগ সহজে জন্মিতে পারে না, বিশেষতঃ যে সকল ক্ষুদ্র ক্রিমি গুহ্যদেশে চুলকণা জন্মাইয়া স্বপ্নবিকার রোগ বৰ্দ্ধিত করে, তাহারাও নির্ম্মূল হয়। মূল-শোধন করিবার সময়ে দুইটী বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ অঙ্গুলির নখ যেন বড় ও অপরিচ্ছন্ন না থাকে। দ্বিতীয়তঃ গুহ্যমধ্যে অঙ্গুলি-চালনা-কালে যেন অত্যধিক বলপ্রয়োগ না করা হয়। প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে গুহ্যদেশে সন্তর্পিত অঙ্গুলিতে সর্ষপ তৈল ব্যবহারের অভ্যাস থাকিলে মূলশোধনী মুদ্রা সহজতর হয়। বাম হস্তের মধ্যমা দ্বারা গুহ্যদেশে আস্তে আস্তে আঘাত করিলে দশ পনের বার আঘাতের পরে গুহ্যমুখ স্বভাবতঃই একটু উন্মীলিত হয়। সেই সময়ে স্বল্প বলপ্রয়োগে অতীব সন্তর্পণে গুহ্যাভ্যন্তরে অঙ্গুলি-চালনা বিধেয়।

---

† অযাচক আশ্রমের মহিলা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্তা কর্ম্মিণী ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী স্ত্রীলোকদিগকে এইগুলি শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। অযাচক আশ্রমে কোনও পুরুষ-কর্ম্মীকে এই সকল মুদ্রা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়ার ভার প্রদান করা হয় না।

এতৎপ্রসঙ্গে আরও দুইটী মুদ্রা ছাত্র-বন্ধুদের হিতার্থে নিম্নে বিবৃত হইতেছে। এই সকল মুদ্রা দ্বারা বাহু এবং হস্তের কর্ম্মসামর্থ্য বর্দ্ধিত হয় বলিয়া এখানে প্রকাশিত হইল। এই মুদ্রাগুলির সহিত বীর্য্য-ধারণের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছুই নাই। মাত্র কাকী মুদ্রা দ্বারা সুষুম্নার দ্বার খুলিয়া যায় বলিয়া মনঃসংযম-সাধনের সহায়তা হয়, সুতরাং তাহা প্রকারান্তরে বীর্য্যধারণের সহায়ক হয়।

(১) অভয়-মুদ্রা :—স্কন্ধের সহিত সমলম্বমান করিয়া ভূমির সহিত সমান্তরাল রাখিয়া বাম বাহু বিস্তার করতঃ হস্তের তালুদেশকে নিম্নাভিমুখী করিয়া রাখ। তৎপরে মণিবন্ধ ভাঙ্গিয়া করাঙ্গুলিগুলিকে যতটা সম্ভব স্কন্ধের দিকে অবনমিত করিতে চেষ্টা কর। যখন খুব কষ্ট বোধ হইবে, তখন বিশ্রামার্থ পুনরায় পূর্ব্ববৎ কিয়ৎকাল রাখিয়া আবার মণিবন্ধ ভাঙ্গিয়া স্কন্ধের দিকে অবনমিত কর। এভাবে কয়েকবার করিয়া বামহস্ত ক্লান্ত হইলে দক্ষিণহস্তে আরম্ভ কর।

(২) কাকীমুদ্রা :—করদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে নিয়া করদ্বয়ের পশ্চাদ্দেশ দ্বারা কটিদেশ স্পর্শ কর। তৎপরে এক হস্তের কনিষ্ঠায়, অনামিকায় ও মধ্যমায় যথাক্রমে অপর হস্তের কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অনামিকা স্পর্শ করাইয়া হস্তাঙ্গুলি-সমূহকে মেরুদণ্ড স্পর্শ করাইয়া ঊর্দ্ধদেশে যতটা সম্ভব, এমন কি পারিলে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লওয়া যায়। তৎপরে পুনরায় নিম্নাভিমুখী কর। এই উভয় মুদ্রাতেই Ulnar Nerve এবং Radial Nerve এর দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়।

[**করন্যাস মুদ্রা** অভ্যাসের ফলেও অঙ্গুলির জড়তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।]

আর একটি মুদ্রা ব্রহ্মচারীদের করা উচিত।

* **অষ্টধ্বনি-মুদ্রা** :—জিহ্বাগ্র উপরের দন্তমূল ও মূর্দ্ধার মধ্যস্থলে লাগাইয়া টক্ টক্ শব্দ আটবার করা। ইহা মনঃসংযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বেশী নহে, মাত্র পূর্ব্বোক্ত কয়েকটা আসন ও মুদ্রার নিয়মিত অভ্যাসেই দেহ ধীরে ধীরে এমন ভাবে গঠিত হইবে যে, ক্রমশঃ অজ্ঞাত বীর্য্যক্ষয়ের সম্ভাবনা, পরিমাণ ও কালের নিকটত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত নিয়ম-কয়টীও পালন করিও।

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর এক মুহূর্ত্তও বিছানায় পড়িয়া থাকিবে না। এই সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপদেশের জন্য "আদর্শ ছাত্র-জীবন" নামক গ্রন্থখানা পাঠ করিবে। সুযোগ পাইলে "সরল ব্রহ্মচর্য্য" ও "আত্মগঠন" হইতে আবশ্যকীয় উপদেশ নিবে।

স্বাস্থ্যে কুলাইলে তিন বেলা স্নান করিবে। প্রাতঃস্নান করিলে দ্বিপ্রহরে স্নান করাও কর্ত্তব্য। নতুবা বায়ু প্রবল হয়। অনিদ্রা-রোগের পক্ষে hip-bath বা নিতম্ব-স্নান বড়ই হিতকর।

অন্ততঃ বত্রিশ বার উৎকৃষ্টভাবে চর্ব্বণ না করিয়া আহারীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবে না এবং ভুক্ত খাদ্য যে জীর্ণ হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট শুক্রে পরিণত হইবে, আহার-কালে বারংবার সেই সঙ্কল্প করিবে। রাত্রিতে লঘু আহার করিবে। আহারের অব্যবহিত পরে নিদ্রা যাইবে না বা নিদ্রার পূর্ব্বে অত্যধিক কথাবার্ত্তা বা উদ্বেগ-জনক বিষয়ের আলোচনা করিবে না। নিদ্রার পূর্ব্বে ঈশ্বর-প্রেম-বর্দ্ধক, চিত্তস্নিগ্ধকর, হিতকর ও প্রীতিপ্রদ বিষয়ের আলোচনা করিবে। এই সময়ে নিজ ভগ্নীদের

"কুমারীর পবিত্রতা" নামক গ্রন্থ পড়িয়া শুনান এক উত্তম প্রয়াস জানিবে।

মলমূত্রের বেগধারণ করিবে না। মলত্যাগ কালে কখনও অনাবশ্যকীয় ভাবে সজোরে কুন্থন দিবে না। মূত্রত্যাগ কালে মুখবিবর জলপূর্ণ করিয়া নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অথবা অসামর্থ্য-পক্ষে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে থামিয়া থামিয়া তিন চারিবারে সবটুকু প্রস্রাব করিবে। প্রস্রাবে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখিলে স্নানকালে একশত ঘটি জল তলপেটে ঢালিবে, অথবা hip-bath বা নিতম্ব-স্নান করিবে।

মলত্যাগান্তে সর্ব্বদা গুহ্যদেশে প্রচুর জলসেচন করিবে। শৌচ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই অবশিষ্ট জল ফেরৎ আনিবে না। মলদ্বারে শীতল জল প্রয়োগ বহুবিধ রোগের প্রশমক এবং ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-নিবারণে সহায়ক। মলস্থানে যাইয়া মলবেগ বা মলত্যাগ না হইলে অনেকে শৌচ করে না। ইহা সুপন্থা নহে। অনেকে ছোট একটি ঘটীতে করিয়া শৌচের জল নিয়া থাকে। ইহাও বিধেয় নহে। মলশৌচান্তে হস্তাদি-ধাবনে সাবান ব্যবহার করিবে।

মলত্যাগের ন্যায় মূত্রত্যাগেও শৌচ একান্ত আবশ্যকীয়। যাহারা মূত্রত্যাগান্তে জল-শৌচ করে না, অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের হাতে জল খান না বা তাহাদের প্রণাম নেন না। সদাচারী বৈষ্ণব ও নিষ্ঠাবন্তী বিধবারা তাহাদিগকে ছুঁইলে স্নান করেন। মূত্রত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জলশৌচ না করাকে মুসলমানেরা ত' এক মহা অপরাধ বলিয়া গণনা করেন। ইহা দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, মূত্রশৌচ কত বড় প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে শুধু নিয়ম-রক্ষার জন্য যা তা বাজে বা অপরিষ্কৃত এক গণ্ডূষ জল

ছোঁয়াইলেই মূত্রশৌচ হয় না, এতটা জল এবং সুশীতল সুপরিষ্কৃত জল এমন ভাবে ঢালা প্রয়োজন, যেন জননেন্দ্রিয়ে সঞ্চিত যাবতীয় ময়লা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন জননেন্দ্রিয়ের ত্বগাবৃত অংশ ফিটকিরি-ভিজান জল দিয়া ধৌত করাও হিতজনক। মলশৌচে স্থলবিশেষে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু মূত্রশৌচ কখনই শীতল জল ব্যতীত উষ্ণ জল ব্যবহার করিবে না। সাবান, সোডা, তৈলাদি ও বরফ জননেন্দ্রিয়ের ত্বগাবৃত অংশে লাগান কখনই উচিত নহে। মূত্রশৌচ না করিয়া কেহ উপাসনা-গৃহে যাইবে না।

রাত্রি-জাগরণ করিবে না। কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া ঘুমাইবে না। শয্যায় একাকী শয়ন করিবে, বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে শ্রদ্ধাভাজন ও ভক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত শয়ন করিবে।

একাকী শয়ন কিন্তু **অপরিচিত, অজ্ঞাত-চরিত্র বা কুচরিত্র ব্যক্তির সহিত প্রাণান্তেও শয়ন করিবে না।** কারণ, জাগ্রদবস্থায় অসচ্চরিত্র লোকের স্পর্শে মনের তামসিকতা যতটা বর্দ্ধিত হয়, নিদ্রাবস্থায় কামুক লোকের স্পর্শে তাহার শতগুণ অধিক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি যে, যদিই কখনো বাধ্য হইয়া কাহারও সহিত শয়ন করিতে হয়, তবে দৃঢ়সঙ্কল্প রাখিও যে, কোনও প্রকার অবমাননাকর ব্যবহারের তিলমাত্র সম্ভাবনা দেখিলেই, **পাষণ্ড-দলনে বজ্রমুষ্টি প্রয়োগ করিতে হইবে।** এই সময়ে আত্মীয়তা, বান্ধবতা, কুটুম্বিতা বা ভদ্রতার মুখ চাহিবার প্রয়োজন নাই কিম্বা

পাষণ্ড-দলন ও লোকলজ্জার ভয় করিলেও চলিবে না। লোক-

লোকলজ্জা লজ্জাভীত আক্রান্ত বালকের নীরবতার সুযোগ

নিয়া অনেক সাধুবেশধারী ভদ্র-পরিচ্ছদ-সজ্জিত লম্পট সমাজের যে শত্রুতা এইভাবে করিতেছে, তাহা সহ্য করিও না, তাহাকে ক্ষমা করিও না, তাহাকে রেহাই দিও না।

নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত দিবানিদ্রা যাইবে না। দিবানিদ্রা রাত্রিতে নিদ্রাল্পতা ঘটায় এবং দেহকে তমোগুণগ্রস্ত করে। যাহাতে কোষ্ঠ-শুদ্ধির ব্যাঘাত না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। ত্রিফলা বা হরীতকী সেবন এবং ফলাদি ভক্ষণ কোষ্ঠশুদ্ধির বিশেষ সহায়ক। রোগচিন্তা করিবে না, আনন্দে থাকিবে। সদানন্দ ভাব চিত্ত-সংযমের ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার পরম সহায়। বিমর্ষ ভাব ব্রহ্মচর্য্যের শত্রু।

দিবানিদ্রা

কৌপীন পরিধান করিবে। কৌপীন ঊর্দ্ধলিঙ্গ হইয়াই পরিধান করা বিধেয়। সন্ন্যাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ অধোমুখ-লিঙ্গেও পরিয়া থাকেন। অধোলিঙ্গে কৌপীন পরিলে ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয় এবং উহা দমন করা সহজ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া সংযম প্রকৃত সংযম নহে। যেন-তেন-প্রকারেণ জনন-যন্ত্রের সামর্থ্য নষ্ট করিতে পারিলেই যদি ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না, অত সাধ্য-সাধনা করিয়া কাহাকেও ব্রহ্মচারী হইতে হইত না, ঔষধ বা অস্ত্রোপচারের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইত। অনেকে বলিয়া থাকে, বীর্য্যবহা শিরা কাটিয়া দিলেই ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। কিন্তু একথা সত্য নহে। কারণ, তাহা হইলে খাসীগুলিকেও লোকে ব্রহ্মচারীই বলিত। ইন্দ্রিয়-সবলতা নষ্ট হইবে না, তথাপি মনের বলে ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় চাঞ্চল্য নিবারিত হইবে,—ইহাই হইল

কৌপীন পরিধান

ব্রহ্মচর্য্যের যথার্থ পরিচয়। সুতরাং তাড়াতাড়ি ইন্দ্রিয়-দমন করিবার লোভে অধোলিঙ্গে কৌপীন পড়িতে যাইও না। উর্দ্ধলিঙ্গে কৌপীন পরিতে প্রবল অসুবিধা হইলে অধোলিঙ্গেই পরিবে। তবে, এই একটুকু সাবধানতা অবলম্বন করিবে, যেন কখনও লৈঙ্গিক উত্তেজনা আসিলে জোর করিয়া লিঙ্গকে চাপিবার চেষ্টা না হয়; অধোলিঙ্গ-কৌপীন একটু শিথিল ভাবে পরাই সঙ্গত। প্রথম-পরিধানকারীদের কাহারও কাহারও কৌপীন পরিতে গেলেই ইন্দ্রিয়ের সাময়িক একটু উত্তেজনা হয়। তাহারা কৌপীন পরিবার আগে কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে কৌপীনের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কয়েকবার গায়ত্রী বা ইষ্টনাম জপ করিয়া লইবে।

কৌপীন অন্ততঃ দুইটী থাকা আবশ্যক। সর্ব্বদা ধৌত ও পরিস্কৃত কৌপীন পরিধান করিবে। মূত্রত্যাগকালে আংশিক ভাবে কৌপীন খুলিয়াই কার্য্য সমাধান করিবে, জননেন্দ্রিয় লইয়া টানা-হ্যাচড়া ভাল নহে। একটি ডোর ও একটি কৌপীন পরিধানের রীতি প্রচলিত আছে কিন্তু একখানা কৌপীন দিয়াই উভয়ের কাজ সারা যায়, যদি কৌপীন সরু কাপড়ের হয় এবং সুদীর্ঘ হয়। বাম স্কন্ধের প্রান্ত হইতে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যতটুকু দৈর্ঘ্য, কৌপীনের দৈর্ঘ্য তাহার দ্বিগুণ প্রয়োজন হয়। শরীরের গঠনানুসারে পাঁচ ইঞ্চি হইতে নয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত প্রস্থের কৌপীন প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কৌপীন-বন্ধন কঠিন হওয়া হিতকর নহে এবং রাত্রিতে কৌপীন পরিয়া নিদ্রিত হইবে না। কিন্তু যাহাদের স্বপ্নবিকৃতির জন্য শুক্রক্ষয় হয়, তাহারা কৌপীন-বন্ধন কঠিন করিয়া নিদ্রা গেলে ঐ রোগের

সাময়িক উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। রাত্রিতে কৌপীন পরিধানের নিষেধের দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহাতে রক্ত-চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে। দ্বিতীয়তঃ জিতেন্দ্রিয় ত্যাগী মহাত্মারা যে কৌপীনকে অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, সুপ্তি-স্খলনাদি দ্বারা অপবিত্র হওয়া উচিত নহে। বন্ধন একটু শিথিল করিয়া শয়ন করিলেই প্রথম আপত্তি খণ্ডিত হয়। কৌপীনের পরিবর্ত্তে লেঙ্গট ব্যবহার করিলেই দ্বিতীয় আপত্তি খণ্ডিত হয়। কিন্তু এতৎ-সম্বন্ধে ইহাই বলিবার আছে যে, অনিচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয়ে নিজেকে কৌপীনের নিকট অপরাধী বিবেচনা করিয়া আত্মগ্লানি সঞ্চয় করা নিষ্প্রয়োজন।

কৌপীন পরিধান-কালীন সৎসঙ্কল্প

কৌপীন পরিধান-কালে মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে যে, যতক্ষণ কৌপীন-পরিহিত থাকিবে, ততক্ষণ মনোমধ্যে কোনও অসংগত বা অসংযত চিন্তাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। সঙ্কল্পই শক্তি, সঙ্কল্পের সাধনাই শক্তির সাধনা। যতবার কৌপীন পরিবে, প্রত্যেকবারই তীব্র ঐকান্তিকতার সহিত সঙ্কল্প করিবে যে, কৌপীন তোমার ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের ব্রত-বন্ধন-; কুচিন্তা দ্বারা, কুবাক্যের দ্বারা, কুচেষ্টার দ্বারা বা কদাচারের দ্বারা তুমি কখনও কৌপীনের সম্মান নষ্ট করিবে না। কৌপীন বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের ব্রহ্মচর্য্যকে অটুট করিয়াছে, আরও কত কোটি সিদ্ধতপা মহাত্মার স্পর্শলাভে ধন্য হইয়াছে, ইহা পরিধান করিয়া কখনও তুমি অব্রহ্মচারীর কাজ করিবে না। কৌপীন পরিয়া যে ব্যক্তি পাপ চিন্তা করে, পাপ কথা বলে, পাপ চেষ্টা করে বা পাপাসক্ত হয়, তাহার মত দুর্ভাগা যে আর কেহ নাই, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিও। ব্রহ্মচর্য্যের ভঙ্গ করিলেই

যে ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইয়া যায় না, তজ্জন্য যে প্রাণান্ত যত্ন পাইতে হয়, একথা কখনও বিস্মৃত হইও না,—প্রত্যেকটী সদাচার ও সুনিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে কদাচার ও কামচিন্তা চিরতরে পরিহার করিবার তীব্র সঙ্কল্প রাখিবে এবং জীবনের সমুন্নত লক্ষ্য ও সুমহান্ আদর্শের প্রতি বারংবার দৃষ্টিক্ষেপ করিবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলে মানুষ অনায়াসে নীচ প্রলোভন ও কদর্য্য আসক্তি পরিহার করিতে পারে, জানিও, তুমি নিশ্চিতই পারিবে। নিজেকে কখনও তুচ্ছ মনে করিও না, আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস কর। আর বিশ্বাস কর যে, **ঈশ্বরে বিশ্বাসই যথার্থ আত্মবিশ্বাস** এবং ভগবানের নামের সাধন করিতে করিতে এই দেবদুর্ল্লভ বস্তু সকলেরই লাভ হয়

—

উপসংহারীয়

মাসে দুই একবার করিয়া স্বপ্নস্খলন হইলে তাহাকে প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করিয়া দুশ্চিন্তার দুঃখজাল ছিন্ন করিও। বংশানুক্রমিক ভাবে কামেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক চর্চ্চার ফলে বর্ত্তমান-কালীন অধিকাংশ মানবের জননযন্ত্র-সমূহে এত দুর্ব্বলতা সঞ্চিত হইয়াছে যে, একবার যদি কোনও বালক বা কিশোর কুসঙ্গ-রাহুর কবলে পড়ে, তাহা হইলে রাহুমুক্ত হইবার পরেও রাহুগ্রহের দন্ত-চিহ্ন তাহার অঙ্গ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইতে চাহে না, মাঝে মাঝে নিদ্রাবিকার ঘটিয়া পূর্ব্ব দুষ্কৃতির স্মৃতিকে সজাগ করিয়া রাখে। এইরূপ স্থলেও হতাশ হইবার কিছুই নাই। **ঘন ঘন নিদ্রাবিকারে বিপন্ন হইয়াও ভগবানের নামের সাধন করিতে করিতে কালে সম্যক্ অক্ষুণ্ণবীর্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন, এমন বহু দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে আছে।** ভগবানের পায়ে নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়াই তাঁহারা এই অকল্পনীয় আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ করিয়াছেন। তোমরা যদি ভগবানের কাজে সব কিছু সঁপিয়া দিবার মত নাও হইয়া থাক, তবু তোমাদের ভয়ের কারণ নাই। সুপবিত্র জীবন-যাপনের দ্বারা এবং আংশিক ভাবেও নিজেকে ভগবানের চরণে সমর্পণের দ্বারা তোমরা দিনের পর দিন সফলতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবেই।

দেশের দুর্গতির আজ অন্ত নাই বলিয়াই মাসে দুই একবার স্বপ্নস্খলনকে সাধারণের পক্ষে প্রায় স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু জন্মাবধি পরিণত যৌবন পর্য্যন্ত যদি কোনও বালককে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষার পরিবেষ্টনে রক্ষা করা যায়, সর্ব্বপ্রকার

অসংযত চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে বালকের জনকজননীর নৈতিক ও মানসিক চরিত্র নিতান্ত জঘন্য না হইয়া থাকিলে তাহার জীবনেই নিদ্রাবিকার-দৌরাত্ম্যের ইতিহাস অন্যরূপ হইয়া যাইবে।

এই জন্যই দেশে আজ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। অনৈতিক কুৎসিত অভ্যাসসমূহ শিখিতে পারিবার আগেই স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধীয় নানা কদর্য্য ধারণা জন্মিতে পারিবার পূর্ব্বেই, চিরব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ সংযত-জীবন ত্যাগশীল গৃহী অধ্যাপকদের প্রাণপাত নিঃস্বার্থ যত্নে পরিচালিত আশ্রম-সমূহে থাকিয়া বিদ্যার্থী বালক যদি জ্ঞানের চর্চ্চায়, দৈহিক ও মানসিক শক্তির সাধনায় এবং স্বাধীন ভাবে স্বশক্তিতে উদরান্ন সংস্থানের যোগ্যতা আহরণে আট হইতে বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষকাল একনিষ্ঠভাবে তপঃপরায়ণ থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মক্ষমতা, উদারতা, সাহসিকতা, জীবপ্রেম ও আত্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ-মনেও রোগনিরোধ-ক্ষমতা ও আত্মসংযমসামর্থ্য তাহার পিতার অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। এই বলবীর্য্যশালী যুবকের সন্তান যদি পুনরায় পূর্ব্বোক্তভাবে সুশিক্ষিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যে এবং মানসিক দৃঢ়তা ও নিরুদ্বিগ্নতায় নিজ পিতা এবং পিতামহ হইতে সর্ব্বাংশে অধিকতর উৎকর্ষবান্ হইবে। ফলে বর্ত্তমান যুবকদের মধ্যে যে পরিমাণ অনিচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয়কে প্রায় স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে হইতেছে, সেই ভবিষ্যদ্বংশীয় যুবকদের মধ্যে তাহা হ্রস্বীভূত হইবে এবং কালক্রমে এই ভারতের শ্যামলশস্পাস্তৃত নয়নমনোহর প্রান্তরে তাঁহারা সকলে মহামিলনের চারুনৃত্য করিতে আসিবেন,

যাঁহারা সম্যগ্‌রূপে ধৃতবীর্য্য এবং স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধরেতা। সেই দিন তাঁহারা আসিয়া এই অধঃপতিত দুর্ভাগ্যরাহুকবলিত চিরতিমিরাবৃত দুঃখিনী ভারতের জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া জননীর প্রতপ্ত বক্ষ জুড়াইবেন, যাঁহাদের রক্তপ্রবাহ হইতে ইচ্ছার অনভিমতে শুক্ররেণুসমূহ পৃথক্‌কৃত হয় না। তাই, সত্য কথা বলিতে গেলে, **বীর্য্যক্ষয়ের প্রকৃত ও স্থায়ী প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইলে দেশের প্রত্যেকটী বালক-বালিকার জন্য আশ্রমীয় (Residential) ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার যথাসাধ্য প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।**

কিন্তু এইরূপ বিরাট অনুষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিতে পারে না। এমন কি, যে রাজশক্তি বর্ত্তমান ভারতীয় সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী নহেন বলিয়া তাঁহারা কখনও এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে সাফল্যলাভ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন না। সুতরাং যাঁহাদের বংশবাহকেরা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া ভারতীয় মহাজাতির মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, যাঁহাদের কুলতিলকেরা ভারতের সকল দুর্ভাগ্যের শৃঙ্খল কটাক্ষের ইঙ্গিতে চূর্ণ করিবেন, তাঁহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজদ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিবার রুচি ও প্রবৃত্তি নির্ব্বুদ্ধিতাই বটে। ভারতের দুর্গতি বিদূরণের জন্য, ভারতের দুর্দ্দশার অপসারণের জন্য আজ ভারতেরই অন্তরাত্মার নিকটে ব্যথিত প্রাণের আকুল ক্রন্দন পৌঁছাইতে হইবে,—ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষার অনুকূলে প্রচণ্ড শক্তিশালী লোকমত সৃষ্টি করিতে হইবে। যেমন লোক-মত-প্রবাহের দুর্দ্ধর্ষ স্রোতের সম্মুখে পড়িয়া ফরাসী নৃপতির স্কন্ধহীন মস্তক হইতে উদ্ধত রাজমুকুট কাঁপিতে কাঁপিতে খসিয়া পড়িয়া ভূমধ্যসাগরের লবণাম্বুরাশির অতল-

তলে চিরতরে ডুবিয়া গিয়াছে, আজ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূলে তেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অলঙ্ঘনীয়, অঘটনঘটনপটীয়ান্ লোকমত সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের সেবার নাম করিয়া দস্যুবৃত্তি ও পরস্বাপহরণ করিবার জন্য নয়, পরন্তু মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, মানুষের মত সসম্ভ্রমে সসম্মানে মরিতে সমর্থ হইবার জন্য এক উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার উদ্বেল তরঙ্গাভিঘাতে আসমুদ্র-হিমাচল বিক্ষুব্ধ করিয়া দিতে হইবে। হে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার্থী যুবক, তুমি আজ যতই দুর্ব্বল বা অক্ষম হও না কেন, এই বিপুল কর্ম্মের ভার তোমাকেও আংশিক ভাবে স্বকীয় স্কন্ধে বহন করিতে হইবে। অব্রহ্মচর্য্যে যদি তোমার জীবনে ব্যর্থতা আসিয়া থাকে, তবে তোমার পরবর্ত্তীগণের জীবন হইতে সেই ব্যর্থতাকে শত যোজন দূরে রাখিবার জন্য আজ সুকঠোর প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। **অসংযমের দুঃখ যদি বুঝিয়া থাক, আপাত-সুখের বিষময় তিক্ততার আস্বাদন যদি পাইয়া থাক, তবে আজ ভারতের ভবিষ্যৎকে বাঁচাইবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আইস।** পূর্ব্ব-গামিগণের অদূরদর্শিতায়, অমনোযোগিতায় এবং ঔদাসীন্যে যদি তোমার বর্ত্তমান বিদগ্ধ হইয়া থাকে, তবে আজ ভবিষ্যৎকে জীবন্ত মৃত্যু হইতে বাঁচাইবার জন্য তোমাকে সতর্ক হইতেই হইবে,—যে সূক্ষ্ম সূত্রটী ধরিয়া অসংযমের আগুন ভবিষ্যতের পানে তাহার লেলিহান রসনা বিস্তারের আয়োজন করিতেছে, বুকের রক্ত ঢালিয়া হইলেও আজ তাহার দহনশীলতা লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। **নিজের মৃত্যুকে ভয় করিও না, তোমার আমার মত লক্ষ লক্ষ মানব অতিশ্রমে অতি-ক্লান্তিতে অকালমৃত্যু বরণ করিয়াই জাতির জীবন-সম্ভাবনাকে বর্দ্ধিত করে।** সমগ্র ভারত জুড়িয়া আজ অসংযমের

খাণ্ডবদহন চলিতেছে, এস আজ আমরা এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড প্রশমিত করিতে যাইয়া নির্ভীক প্রাণে আত্মবিসর্জ্জন দেই। হয়ত আমাদের উত্তেজনাহীন নীরব উৎসর্গে দেশবাসীর চিত্ত চমৎকৃত হইবে না, হয়ত আমাদের দুর্ল্লভতম সাফল্যগুলিও কাহারও করতালিতে অভিনন্দিত হইবে না, হয়ত আমাদের কঠোরতম কষ্টগুলিকেও কেহ আসিয়া যথার্থ মূল্যের এক-সহস্রাংশ দিতে স্বীকৃত হইবে না—কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? আমাদের জীবনাহুতির ভস্মস্তূপ ভেদিয়া নবভারতের পূর্ণ-যৌবন-শ্রীমণ্ডিত-পুণ্যমহিমাদীপ্তা পরমকল্যাণী মহামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইবেন।

প্রথম পরিশিষ্ট

নিদ্রাবিকার ও তাহার চিকিৎসা

নিদ্রাযোগে শুক্রক্ষয়ের দুইটী অবস্থা আছে। এক অবস্থায় ইহাকে ব্যাধিরূপে গণনা না করিয়া "প্রায়" স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অপর অবস্থায় উহাকে ব্যাধিরূপেই গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমোক্ত অবস্থায় যুবকদের তত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, নিয়মিত জীবন-যাপনের এবং এই গ্রন্থে লিখিত উপদেশ-সমূহ পালনের দ্বারাই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব। কিন্তু অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার ফলে অণ্ডকোষ, কামগ্রন্থি, শুক্রকোষ এবং মস্তিষ্কে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা সঞ্জাত হইলে এমন অবস্থা আসিতে পারে, যখন ইহাই যথেষ্ট নহে, সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত

চিকিৎসাও আবশ্যক। কিন্তু এই রোগের প্রকৃত চিকিৎসাও অতি কঠিন। কারণ, অণ্ডকোষ, কামগ্রন্থি, শুক্রাশয় বা মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্ কয়টির একান্ত দৌর্ব্বল্য-হেতু ঘন ঘন স্বপ্নস্খলন হইতেছে, তাহা ঠিকমত নির্দ্ধারিত না হইলে পদ্ধতিবদ্ধ চিকিৎসা হইতে পারে না। ফলে অনুমানের উপরে অথবা অনভিজ্ঞ লোকের উপদেশানুসারে নানা ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগী হতাশ হইয়া পড়ে এবং যখন প্রকৃত ঔষধের সন্ধান হয়, তখন অবিশ্বাস করে। এইজন্য একটী অতিশয় ফলপ্রদ মহোপকারী ঔষধের প্রস্তুতবিধি লিখিত হইল। প্রত্যেক যুবক ইচ্ছা করিলেই ইহা নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। *

মকরধ্বজ—	॥০ তোলা	কাবাবচিনি—	১ তোলা
বঙ্গভস্ম—	১ "	আমলকী—	১ "
শুলফের চিনি—	১ "	চন্দনতৈল—	প্রতি মাত্রায় এক ফোঁটা
বিশুদ্ধ কর্পূর—	৵০ আনা		
শিমূল-মূল	১ তোলা	সেবন মাত্রা	৵০ আনা।

বঙ্গভস্ম ও মকরধ্বজ সততা-সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীর নিকটে গ্রহীতব্য। অনেক কবিরাজ রসসিন্দূরকে মকরধ্বজ নাম দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে গুণের অতিশয় ন্যূনতা হইবে। কাবাবচিনি

---

* যাহাদের পক্ষে নিজে প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না, তাহারা কবিরাজ "শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন, ৩৬ নং কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতায়" বা "অযাচক আশ্রম, বারাণসী" এই ঠিকানায় পত্র দিলে "ব্রহ্মচর্য্য-বান্ধব" সঙ্গত মূল্যে পাইবেন।

এবং শুষ্ক আমলকী পসারী দোকানে পাওয়া যায়। শিমূলতুলা গাছের গোড়ায় অনেক ছোট ছোট চারা জন্মে। সেই চারার মূলটা অতি নরম থাকে, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। উৎকৃষ্টরূপে ধুইয়া টুকরা টুকরা কাটিয়া রোদ্রে শুকাইয়া তারপর ইহাদের কাপড়-ছাঁকা সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। কাবাবচিনির বোঁটা ও আমলকীর বীজ বাদ দিতে হইবে। চূর্ণ করিবার পূর্ব্বে সব জিনিষই বাছিয়া উৎকৃষ্ট অংশটুকু লইবে। যাহা অপকৃষ্ট মনে করিবে, তাহা ফেলিয়া দিবে। ঔষধ প্রস্তুত করিতে নিকৃষ্ট উপাদান ব্যবহার করা মস্ত-বড় মূর্খতা। সুগন্ধহীন হইলে কাবাব-চিনি এবং সুস্বাদহীন হইলে আমলকী নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে এবং তাহা পরিত্যাগ করিবে। গুলঞ্চের চিনি কোথাও কোথাও কবিরাজদের নিকট পাওয়া যায়। যেখানে তাহা মিলিবে না, সেখানে কতগুলি পদ্ম-গুড়ুচি (আমগুলঞ্চ নহে) সংগ্রহ করিয়া তাহা খুব করিয়া থেত্‌লাইয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে নীচে যে ময়দার মত সূক্ষ্ম ও শাদা শাদা তলানি পড়িবে, তাহাই সংগ্রহ করিবে। ইহারই নাম গুলঞ্চের চিনি। পূর্ব্বোক্ত উপাদানগুলির দুই আনাতে এক ফোঁটা বিশুদ্ধ চন্দন-তৈল (চন্দনের আরক নহে) মিশাইলেই স্বপ্নবিকারের অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ "ব্রহ্মচর্য্য-বান্ধব" প্রস্তুত হইল। এই ঔষধ দুই আনা পরিমাণ লইয়া তিন গুণ পরিষ্কার চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ ছটাক ত্রিফলা (অর্থাৎ আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া) ভিজান জলসহ খাইবে এবং অজীর্ণ ও অম্লরোগ না থাকিলে ঔষধ সেবনের দশ বারো মিনিট পরে এক পোয়া কি দেড় পোয়া শীতল জল সেবন করিবে। ত্রিফলা থেতো করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

"ব্রহ্মচর্য্য-বান্ধব" নিয়মিতভাবে দুই তিন মাস কাল সেবন না করিয়া বিশ্বাস করিও না যে, তোমার রোগ নিরাময় হইবে না। আয়ুর্ব্বেদে আছে—"সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি, তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম, দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্। অর্থাৎ—সিংহ যেমন হস্তিসমূহ বিনাশ করে, বঙ্গভস্ম তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নষ্ট করিয়া থাকে, ইহা শরীরের সুখদায়ক, চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য-সম্পাদক ও নিশ্চয়ই মানবের পুষ্টিবিধায়ক।" শুলক্কের গুণ—মেহনাশক (বাগ্‌ভট), বলবর্দ্ধক (ভাবপ্রকাশ), হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন-নিবারক (বঙ্গসেন), মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হিতকর (আর, এন, খোরী)। কাবাবচিনির গুণঃ—ঔপসর্গিক-মেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্; কৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ,—অর্থাৎ কাবাবচিনি ঔপসর্গিক মেহ, সুদারুণ শুক্রমেহ এবং এমনকি মূত্রকৃচ্ছ্রও বিনাশ করে।" শিমুল মূলের গুণঃ—শুক্রশুদ্ধিকর (হারীত), স্নিগ্ধ, রসায়ন, ধাতুসাম্যকর, মূত্রের অতিরঞ্জন ও তলানি পড়া নিবারক।" (R. N. Khory, Vol, II p. 103)। আমলকীর গুণঃ—প্রমেহনাশক (সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট), মূত্ররোগ-প্রশমক (ভাবপ্রকাশ ও বঙ্গসেন) প্রস্রাবের যন্ত্রণানাশক (সুশ্রুত), পুষ্টিকারক ও রসায়ন। মকরধ্বজঃ—মস্তিষ্কপোষক, বায়ু-প্রশমক, ধাতু-সাম্যকারক, পরিবর্ত্তক, রসায়ন, ও যোগবাহী অর্থাৎ সঙ্গীয় অন্যান্য ঔষধের গুণাধিক্য-সম্পাদক। চন্দনঃ—শুক্রমেহ-নাশক। কর্পূরঃ—শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, সুনিদ্রাজনক, কামশান্তিকর ও শুক্রমেহনাশক।

"ব্রহ্মচর্য্য-বান্ধবের" প্রত্যেকটী উপাদানই পৃথক্‌ভাবে এক একটী ফলপ্রদ ঔষধ। এই সকল উৎকৃষ্ট উপাদান একত্র সংমিশ্রিত হওয়াতে

যে বিশেষ গুণ জন্মে, তাহারই ফলে ইহা সেবনের দ্বারা মূত্রযন্ত্রের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, কামগ্রন্থির স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসে, শুক্রকোষের বৃথা উত্তেজনা-প্রবণতা কমে, অণ্ডকোষের স্নিগ্ধতা জন্মে এবং মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। এই জন্যই ইহা * নিদ্রাবিকারের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

কিন্তু ঔষধ যতই উৎকৃষ্ট হউক, তোমাকে এ কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, সংযত থাকিতে যদি চেষ্টা না কর, নিজের মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যদি যত্ন না লও, তাহা হইলে ঔষধ সেবনে সাময়িক উপকার হইলেও স্থায়ী ফল হইবে না। ব্যায়াম, উপাসনা ও সদাচার, এই তিনটি সহপানের সহিত ঔষধ সেবন করিবে এবং দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইবে। ব্যায়ামের দ্বারা স্বপ্নস্খলন-রোগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া অনেকের একটা কুসংস্কার আছে। সাধ্যের অতিরিক্ত অতি উগ্র ব্যায়ামে ক্ষতি হয়, ইহা ঠিক। কিন্তু নিজ শক্তি অনুযায়ী আস্তে আস্তে ব্যায়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ক্ষতি ত হয়ই না, অমৃততুল্য উপকারই সাধিত হয়। আজ লোকের অসম্পূর্ণ মতামতের মুখ চাহিয়া চলিও না, চলিতে হইবে তোমার নিজের মঙ্গলের মুখ চাহিয়া। ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া প্রথম দুই চারি দিন যদি শরীর একটু ম্যাজমেজে বোধ কর, তাহা হইলেও

---

* "ব্রহ্মচর্য্য-বান্ধবের"ই সবগুলি উপাদান লইয়া এবং ইহার সহিত আরও কতকগুলি মূল্যবান্ উপাদান-সংযোজন করিয়া "বিন্দুবন্ধু" নামক ঔষধ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাহারা 'বিন্দুবন্ধু' ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাহারা বারাণসী অযাচক আশ্রমের ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

ঘাবড়াইয়া যাইও না। অধ্যবসায়-সহকারে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ব্যায়াম সাধিয়া যাইবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই ব্যায়ামের প্রত্যক্ষ ফল প্রকটিত হইবে। কুসঙ্গ, কদাচার ও আত্ম-অবিশ্বাস প্রাণপণে বর্জ্জন করিবে। **মনকে নিম্নাঙ্গে নামিতে দিবে না, সর্ব্বদা যাহাতে মনকে ভ্রূমধ্যে রাখিতে পার, তাহার জন্য যত্নবান্ হইবে এবং প্রত্যেকটি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে ভগবানের নামজপ করিবে।** তোমার যে অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী, এই বিষয়ে বারংবার সুতীব্র সঙ্কল্প করিবে। ব্যায়ামকালে সঙ্কল্প করিবে, তোমার অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইবেই, উপাসনাকালে সঙ্কল্প করিবে—সম্পূর্ণ ধৃতবীর্য্য তুমি হইবেই, আহারকালে সঙ্কল্প করিবে,—প্রতি গ্রাস অন্ন তোমাকে নূতন তেজ, নূতন বীর্য্য, নূতন বল দান করিবেই। শয়নের পূর্ব্বে তীব্র সঙ্কল্প করিবে যে, তুমি অক্ষুণ্ণবীর্য্য, মধ্যরাত্রে হঠাৎ কখনও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে উঠিয়া বসিয়া সঙ্কল্প করিবে,—তোমার বীর্য্য কখনও ক্ষয়িত হইতে পারে না। এইভাবে **সঙ্কল্পের শক্তিকে বর্দ্ধিত কর এবং নিজের সঙ্কল্পকে বিশ্বাস কর।** এ-জগতে বিশ্বাসের তুল্য শক্তি **নাই, বিশ্বাসের তুল্য অস্ত্র নাই।**

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

প্রাণায়াম

প্রাণায়ামের শক্তিও অপরিসীম, সাধক-সমাজে প্রাণায়ামের সমাদরও অতুলনীয়। ইহা দেখিয়া অনেকেই প্রাণায়াম শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং আগ্রহের আতিশয্য-বশতঃ

কখনও পুস্তক দেখিয়া, কখনও অসম্যগ্‌দর্শীর নিকটে অসম্পূর্ণ উপদেশ লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া পরিশেষে বিশেষভাবে বিপন্ন হন। বর্ত্তমানে দেশমধ্যে যৌগিক সাধনা সম্বন্ধে যে নবজাগরণ দেখা যাইতেছে, তাহার ফলে অপথ-পরিচালিত প্রাণায়াম-সাধনা-জনিত বিপদের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

এইজন্য এই পরিশিষ্টে প্রাণায়ামের সাধনের কতিপয় নিরাপদ ক্রম লিপিবদ্ধ হইল। তথাপি বলাই বাহুল্য যে, পুস্তক দেখিয়া কখনও প্রাণায়াম শিক্ষা হয় না, পরন্তু প্রাণায়াম সম্বন্ধে আচার্য্যের নিকট প্রাপ্ত উপদেশের মাত্র স্মৃতিটুকু জাগ্রত হয়। সুতরাং প্রাণায়াম শিখিতে হইলে যেন কেহ প্রাণায়াম-সিদ্ধ ও বর্ত্তমান যুগের আয়োজন ও প্রয়োজনদর্শী যথার্থ আচার্য্যের সহায়তা ব্যতীত একটি পদও প্রসারিত না করেন। পুস্তকাদিতে অনেক প্রকারই লেখা থাকে এবং শাস্ত্র হইতে সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়া থাকে সত্য কিন্তু প্রাণায়াম সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব তাহা দেখিয়া কখনও নির্ণীত হইতে পারে না, তাহা নির্ণয়ের ক্ষমতা একমাত্র সিদ্ধাচার্য্যেরই আছে। তিনটী বিভিন্ন রোগীর সর্দ্দি হইলে পরে কবিরাজ যেমন অবস্থা বুঝিয়া একজনের জন্য তুলসী-পাতার রস, দ্বিতীয় জনের জন্য ধুস্তুর-পত্রের চূর্ণ এবং তৃতীয় জনের জন্য কুঁচিলার অরিষ্ট ব্যবস্থা করেন, ঠিক তেমনই প্রাণায়াম-পিপাসু সাধকের জন্যেও যথার্থ আচার্য্য বিভিন্ন জনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বুঝিয়া বিভিন্নরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বরোগহর মহৌষধ জগতে নাই, তাহাও নহে। নিম্নলিখিত ক্রমগুলি অনেকের পক্ষে গুরূপদেশের স্মারক-স্বরূপ হইবে।

প্রথম ক্রম

যিনি আত্মাশক্তিস্বরূপ, যিনি পরমানন্দস্বরূপ, যাঁহার প্রেরণায় ব্রহ্মাণ্ডের সকল-কিছু চলিতেছে, যিনি সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের একমাত্র নিয়ন্তা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিয়া তাঁহার পবিত্র নাম সংখ্যা রাখিয়া একশত আট বার জপ করিবে।

তৎপরে পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করিবে। বলপূর্ব্বক শ্বাস-প্রশ্বাসকে ধীরগামী বা মন্থর করিতে চেষ্টা পাইবে না। ইহার নাম **নির্বীজ সহজায়াম।**

প্রত্যহ উপাসনা-কালে এইরূপ একমাস অভ্যাস করিবে।

দ্বিতীয় ক্রম

শ্বাসপ্রশ্বাসকে কিঞ্চিৎ ধীরগামী করিয়া (অর্থাৎ অত্যধিক ধীরগামী না করিয়া, এমন কি মধ্যম রকমের ধীরগামীও না করিয়া, মাত্র ঈষৎ পরিমাণে ধীরগামী করিয়া) একশত আটবার নামজপ করিবে (সামান্যা, সমানা, প্রগ্রাহিণী, প্রত্যাগিনী)। এই সময়ে কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবরোধ করিবে না। ইহার নাম **বিশিষ্টায়াম।**

তৎপরে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল লক্ষ্য করিতে থাকিবে। এই সময়ে শ্বাসের সহিত একবার এবং প্রশ্বাসের সহিত একবার বীজমন্ত্র বা প্রণব উচ্চারণ করিবে। ইহার নাম **সজীব সহজায়াম বা সগর্ভ সহজায়াম।**

এইরূপ একমাস অভ্যাস করিবে।

তৃতীয় ক্রম

শ্বাস-বায়ুকে ঈষৎ ধীরগামী করিয়া একবার গৃহীত বায়ুকে অতি অল্পকাল মাত্র ভিতরে রাখিয়া একবার এবং পরিত্যাজ্য নিঃশ্বাসকে ঈষৎ

ধীরে পরিত্যাগ করিতে করিতে আর একবার নাম জপ করিবে। এইরূপে একশত আটবার নাম জপিবে অর্থাৎ ৩৬ বার প্রাণায়াম করিবে। ইহার নাম **আর্য্য-পূর্ণায়াম বা বৈদিক পূর্ণায়াম।** *

তৎপরে দশ হইতে পনের মিনিট কাল স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রণব বা বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে এবং শ্বাস-গ্রহণের পরে ও প্রশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বে স্বাভাবিক ভাবে বায়ু যে অতি অল্প সময়টুকু স্থির থাকে, তখন একবার বীজমন্ত্র জপিবে। ইহার নাম **আভ্যন্তর সহজায়াম।**

এইরূপ এক পক্ষ কাল অভ্যাস করিবে।

চতুর্থ ক্রম

প্রশ্বাস-বায়ুকে ঈষৎ ধীরগামী করিয়া ত্যাগ করিতে করিতে একবার নাম জপ, পরিত্যাগের পর গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি অল্পমাত্র সময় বায়ু বাহিরে ধরিয়া রাখিয়াই পুনরায় একবার নামজপ এবং তৎপর শ্বাস-বায়ুকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে করিতে একবার নাম জপ করিবে। * ইহার নাম **তান্ত্রিক পূর্ণায়াম।**

তৎপরে দশ হইতে পনের মিনিট কাল স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রণব বা বীজমন্ত্র জপ করিবে এবং প্রশ্বাস ত্যাগের পরে ও শ্বাস গ্রহণের পূর্ব্বে বায়ু যে অতি অল্পকাল আপনা-আপনি স্থির থাকে, তখন একবার প্রণব বা বীজমন্ত্র জপিবে। ইহার নাম **বাহ্যবৃত্ত সহজায়াম।** এইরূপ একপক্ষ কাল অভ্যাস করিবে।

পঞ্চম ক্রম

শ্বাসবায়ুকে ঈষৎ ধীরগামী করিয়া গ্রহণ করিতে করিতে একবার

* জপনীয় নাম অত্যন্ত দীর্ঘ হইলে এই প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ।

নামজপ, স্বল্পকালমাত্র কুম্ভকদ্বারা ভিতরে বায়ুধারণ করিয়া একবার নাম-জপ, প্রশ্বাসবায়ু ঈষৎ ধীরগামী করিয়া ত্যাগ করিতে করিতে একবার নামজপ এবং অত্যল্পকাল বায়ু বাহিরে ধরিয়া রাখিয়া একবার নামজপ করিবে। এইরূপে ১০৮ বার নাম জপিবে, অর্থাৎ ২৭টী প্রাণায়াম করিবে। * ইহার নাম **সম্পূর্ণায়াম**।

তৎপরে পনের মিনিট কাল স্বাভাবিক শ্বাসে একবার, স্বাভাবিক ভাবে বায়ু যে সময়টুকু অভ্যন্তরে থাকে, সেই সময় একবার, স্বাভাবিক প্রশ্বাসে একবার এবং স্বাভাবিকভাবে বায়ু যে সময়টুকু বাহিরে গিয়া স্থির হইয়া থাকে, সেই সময়ে একবার বীজ বা প্রণব জপ করিবে। ইহার নাম **সম্পূর্ণ সহজায়াম**।

এইরূপ একমাস কাল অভ্যাস করিবে।

ষষ্ঠ ক্রম

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী ক্রম অভ্যস্ত হইয়া গেলে দিবারাত্রি সর্ব্বদা উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে সর্ব্ব-সময়ে পথে, ঘাটে, গৃহে বাহিরে সর্ব্বত্র **"সম্পূর্ণ সহজায়াম"** নামক প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্ভবনা হইতে সম্যগ্‌রূপে মুক্ত। ইহাই শাস্ত্রে কেবলী প্রাণায়ামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* জপনীয় নাম দীর্ঘ হইলে এই প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

কোন্ ব্যাধি কোন আসন বা মুদ্রা-অভ্যাসে দূরীভূত বা প্রতিষেধ-প্রাপ্ত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

(আসন ও মুদ্রাগুলি ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইলে নিম্নলিখনানুযায়ী ফল পাইবে। প্রত্যেক আসন-মুদ্রার বিস্তারিত ফলাফল তৎ তৎ আসন-মুদ্রার বিবৃতি সম্পর্কে যথাস্থানে দর্শনীয়)

গুণ	আসন বা মুদ্রা	কত দিবস মধ্যে উপকার অনুভবের সম্ভাবনা?
মনের অস্থিরতা, স্নায়ুশূল ও পায়ের বাত-নিবারণে	মুক্ত পদ্মাসন	একমাস হইতে দুইমাস
পুরুষের হার্ণিয়া, স্ত্রীলোকের জরায়ুর স্থানচ্যুতি, মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা ও আনুষঙ্গিক ভাবে বাত-নিবারণে।	বদ্ধ পদ্মাসন	পনের দিন হইতে এক মাস
মনের অস্থিরতা, স্ত্রীলোকের জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও আনুষঙ্গিক ভাবে পুরুষের সুপ্তিস্খলন-নিবারণে	সুখ গোমুখাসন	একমাস হইতে দুইমাস

created by Mukherjee TK,Dhanbad

গুণ	আসন বা মুদ্রা	উপকার অনুভবের সময়
কুমারী অবস্থায় অভ্যাসের ফলে প্রথম প্রসবের বিপদ-নিবারণে, পুরুষের বীর্য্য-ধারণ ক্ষমতা-বর্দ্ধনে, পায়ের উর্দ্ধাংশের বাত-নিবারণে	কূর্ম্মাসন	একমাস হইতে দেড় মাস
কূর্ম্মাসনের সকল গুণ বজায় রাখিয়া স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধনে	সপ্রণতি কূর্ম্মাসন (অতি দুর্ব্বল ব্যক্তির নিষিদ্ধ)	তিন মাস হইতে ছয় মাস
পায়ের বাত, পেটের চর্ব্বি, ঘাড়ের ব্যথা, কোমরের বাত, মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা-নিবারণে ও মৃদুভাবে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনে	ভুজঙ্গিনী মুদ্রা বা যৌগিক বুক-ডন	পাঁচ দিন হইতে পনের দিন
কোমরের বাত ও পদদ্বয়ের জড়তা-নিবারণে	ভেকাসন	দশ দিন হইতে পনের দিন
কোমরের বাত, পায়ের বাত, ঘাড়ের ব্যথা ও জড়তা, মস্তিষ্কের জড়তা, মেরুদণ্ডের জড়তা-নিবারণে, স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধনে ও সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ-বিদূরণে	পশ্চিমোত্তান আসন	পাঁচ দিন হইতে দশ দিন

গুণ	আসন বা মুদ্রা	উপকার অনুভবের সময়
পশ্চিমোত্তান আসনের তুল্য কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ফল-লাভার্থে	উগ্রাসন	পাঁচ দিন হইতে দশ দিন
উগ্রাসনের তুল্য কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ফল-লাভার্থে	অনুবজ্রাসন	ঐ
মস্তিষ্কের অবসাদ ও ঘাড়ের বেদনা-নিবারণে, স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধনে, সুনিদ্রা-সম্পাদনে	মস্তকাবর্ত্তনী মুদ্রা	দশ দিন হইতে পনের দিন
উল্লিখিত মস্তকাবর্ত্তনী মুদ্রার সবগুলি গুণ একটু অধিক পরিমাণে সম্পাদনার্থে এবং সঙ্গে সঙ্গে আংশিক বাত-নিবারণে ও মেরুদণ্ডের জড়তা-বিনাশনে	সপ্তাবর্ত্তনী মহামুদ্রা	ঐ

গুণ	আসন বা মুদ্রা	উপকার অনুভবের সময়
স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধনে, মস্তিষ্কের অবসাদ-নিবারণে	মূর্দ্ধাকর্ষণী মুদ্রা	পাঁচ দিন হইতে পঁচিশ দিন
দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধনে ও বধিরতার আংশিক প্রশমনে	ঐ	একমাস হইতে তিনমাস
অজীর্ণ-নাশে, অগ্নি-সন্দীপনে, বহুমূত্র প্রতি-ষেধে, পুরুষের জননে-ন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা-জনিত বীর্য্যক্ষয়-নিবারণে, স্ত্রী-লোকের জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা-জনিত শ্বেত-স্রাব-প্রশমনে, অত্যধিক কামোত্তেজনার আংশিক হ্রস্বীকরণে ও স্ত্রীলোকের জরায়ুর স্থানচ্যুতি-নিবারণে	সন্দীপনী-মুদ্রা, সঞ্জীবনী-মুদ্রা, কুলাঞ্জনী-মুদ্রা, স্বপ্নসন্দীপনী-মুদ্রা	একুশ দিন হইতে দুই মাস
সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদে ও নবজীবন সঞ্চারণে	লঘু-মহামুদ্রা	সাত দিন হইতে একুশ দিন

গুণ	আসন বা মুদ্রা	উপকার অনুভবের সময়
হাতের বাত-নিবারণে, করাঙ্গুলির জড়তা-বিদূরণে, লিখন-কম্প-(Writer's cramp) নিরাময়ে	অভয়া-মুদ্রা	সাত দিন হইতে পনের দিন
উল্লিখিত অভয়া-মুদ্রার যাবতীয় গুণ সম্পাদনার্থে, বাহুর বাত-নিবারণে, মেরুদণ্ডের সরলতা সম্পাদনে, মনের অস্থিরতা-নিবারণে	কাকী-মুদ্রা	ঐ
পায়ের বাত নিবারণে, সংযমোৎসাহ-বর্দ্ধনে	অল্প-মহামুদ্রা ও উত্তান-গোমুখাসন	পাঁচ দিন হইতে বারো দিন
অর্শরোগ-নিবারণে, ইন্দ্রিয়-সংযম সাধনে বীর্য্যক্ষয় নিবারণে, জরায়ুর স্থানচ্যুতির প্রতিকারে	অশ্বিনী-মুদ্রা ও যোনিমুদ্রা	এক মাস হইতে তিন মাস
জননেন্দ্রিয়ের প্রবল উত্তেজনা-প্রশমনে, উদ্দাম ভোগ-লালসার প্রশমনে, গুপ্ত অঙ্গে লালসা-জনিত রস-নিঃস্রাব-নিবারণে	ঐ	তিন দিন হইতে ছয় দিন

গুণ	আসন বা মুদ্রা	উপকার অনুভবের সময়
স্ত্রীলোকের রজঃকৃচ্ছ্রতা-নিবারণে, অত্যন্ত রজঃ-স্রাবের প্রশমনে, মাসিক রজঃস্রাবকালীন যন্ত্রণা-দায়ক উপসর্গ-সমূহের প্রশমনে, অনিয়মিত রজঃ-স্রাবের নিয়মানুগত্যের প্রতিষ্ঠায়, রজঃস্রাবকালীন মনশ্চাঞ্চল্য-প্রশমনে।	স্বপ্নসন্দীপনী (মাসে পাঁচ দিন অভ্যাস বন্ধ রাখিতে হয়, রজঃস্রাবের তিনদিন ও তৎপরে দুই দিন)	এক মাস হইতে তিন মাস
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনের ত্রুটিতে বা কোনও ঔপ-সর্গিক বিষের সংক্রমণে জন্মে নাই এমন পুরুষত্ব হীনতা ও বন্ধ্যাত্ব-নিবারণে, জরায়ু বা পাকস্থলীর স্থানচ্যুতি-নিবারণে, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের পুরুষোচিত এবং নারী-জনোচিত কর্ত্তব্য-পালনের ক্ষমতা-বর্দ্ধনে।	সন্দীপনী, সঞ্জীবনী, কুলাঞ্জনী, অশ্বিনী ও যোনিমুদ্রা	অনির্দ্দিষ্ট (ফলাফল দেহের গঠনের উপরে নির্ভর করিবে)
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে।	যোনিমুদ্রা ও কুলাঞ্জনী-মুদ্রা	অনির্দ্দিষ্ট (ফলাফল মানসিক একাগ্রতার উপরে নির্ভর করিবে)

বিবরণ মোটামুটি ভাবেই প্রদত্ত হইল। অভ্যাসকারীর শরীর, মন, রুচি প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনুসারে কথঞ্চিৎ তারতম্য হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু গভীর নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও পূর্ণ বিশ্বাস দূরবিলম্বী সুফলকেও নিকট-লভ্য করিয়া থাকে।

(সমাপ্ত)

"ব্রহ্মচর্য্যই মহাশক্তির মূল উৎস।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—